এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ভূমিকা

আমার অবসর সময়ে চিত্ত বিনোদনের জন্য কয়েকটি ছোট ছোট সত্য ঘটনা লইয়া এই "বিচিত্র কাহিনী" লিখিত। ইহাদের মধ্যে কিছু কিছু 'মাসিক বসুমতী' 'মৌচাক' ও 'যুগান্তর' ইত্যাদিতে বাহির হইয়াছে। অল ইণ্ডিয়া রেডিওতেও আমি ইহার দু' তিনটি ঘটনা বলিয়াছিলাম। এগুলি পড়িয়া আমার কতিপয় বন্ধু-বান্ধব কাহিনীগুলি পুস্তক আকারে ছাপিতে অনুরোধ করেন। প্রথম গ্রন্থকাররূপে নিজেকে প্রকাশ করিবার যে সঙ্কোচ তাহাতে এই প্রস্তাবে আমি প্রথমে খুব উৎসাহিত বোধ করি নাই। কিন্তু পরে যখন আমার বন্ধু শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার এই পুস্তক ছাপিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন তখন আমি আর সম্মত না হইয়া পারিলাম না। এগুলি পড়িয়া পাঠক-পাঠিকাদের যদি ভাল লাগে তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক হইবে।

আমার শিকার সম্বন্ধে আমার অনুজ প্রতিম, বিখ্যাত লেখক, 'পথচারী' একটি ঘটনা, কয়েক বৎসর পূর্বে যুগান্তরের পূজা সংখ্যায় বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাহাও সন্নিবিষ্ট করা হইল।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

অমৃত বাজার পত্রিকা আপিস
কলিকাতা
১৭ই আশ্বিন ১৩৬১

সূচীপত্র

যুদ্ধের অনেক আগে যখন সস্তা-গণ্ডার দিন, তখন কলকাতার কিছু দূরে একটা বাগান কিনেছিলাম। শহর থেকে খুব বেশী দূর নয়, দরকার পড়লে আধঘণ্টায় পৌঁছানো যায়। আবার নিরিবিলিও আছে, দিনরাত লোকে জ্বালাতন করে না। সেইজন্যে মধ্যে মধ্যে আমি বাগানে বাস করি।

কিন্তু কিছুদিন হোলো আমার মনে হচ্ছে যে, যে-শহর থেকে পালিয়ে থাকার জন্যেই এই বাগানে বাস, সেই শহরই যেন গুটি-গুটি এগিয়ে আসছে আমার অত সুখের নিরিবিলি বাগানের পানে।

একবার চিন্তা করে দেখ আমার কি ভীষণ বিপদের আশঙ্কা!

মনের ভেতর সেই কথা নিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে বাগানের ফটকের দিকে চলেছি। আকাশে বিকেলের রোদের আলোয় বর্ষা-শেষের মেঘ ভেসে চলেছে। কখনও বা সেদিকে দেখছি, কখনো বা ফটকের বাইরে বড় রাস্তার দিকে।

কানে একটা মিহি গলার মিঠে সুর এলো। ফিরে দেখি আমার ছোট্ট নাতনী-ঠাকুরানী। তার মুখ দেখে যেন সব ভাবনা চিন্তা দূর হয়ে গেল। তার পরই এল ফরমাশ—"দাদু একটা গল্প বলনা।"

"কিসের গল্প বলবো বল, পাখীর গল্প, শিকারের গল্প, বাঘের গল্প ?"

কোনটাই দিদিরানীর পছন্দ হলো না। তার চাই পরীর গল্প! এখন আমি যে-সব গল্প বলি বা লিখি সে-সবই সত্যি! অর্থাৎ কিনা আমার নিজের জীবনের সত্য ঘটনাকে গল্পের ছলে বলা। তাতে একটু আধটু রং ফলানও হয় তো থাকে, তার বেশী নয়। ইনিয়ে-বিনিয়ে মনগড়া কথা জুড়ে রূপকথা রচনা আমার আসেই না। এদিকে দিদিরানীর ফরমাশ পরীর গল্প, তাও ঠেলা যায় না। আমার দিদিরানীকে তুচ্ছজ্ঞান করা একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু পরীর গল্প বলিই বা কি করে ? সাত-পাঁচ-পঁচিশ ভেবে শেষে বল্লামঃ—

"আমি তো জন্মে পরী দেখিনি ভাই। এক যা তোমায় দেখেছি। তবে তোমার গল্পই বলতে হয়।"

"যাঃ, আমি তো সত্যিকারের রিতা, গল্পের পরী নই। আমায় নিয়ে গল্প কি করে হ'বে ?"

"না দিদিরানী, খুব হয়। আমি তোমায় সত্যি বলছি, এই এখুনি যদি ঐ মেঘের আড়াল থেকে, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে, মাথার মুকুটে সাতরাজার ধন মানিক, গলায় গজমতি মুক্তোর হার পরা, সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারের দেশের রাজপুত্তুর নেমে এসে তোমায় বিয়ে করতে চায় তো আমি একেবারেই আশ্চর্য হব না।"

"না, সে আবার কি? আর তাই যদি সত্যিই হয় তো আমার গল্প আমিই বা শুনবো কেন, সেতো আর কেউ শুনবে।"

দেখতো বিপদ। কাগজের সম্পাদক হিসেবে অনেক সময় অনেক বিপাকে পড়েছি, কিন্তু এরকম নয়। দিদিরানীর অনুরোধ এড়ানও যায় না। কি মুশকিল!

মহা ভাবনায় পড়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখছি কিছু ঠাওর করতে পারি কিনা, এমন সময় দেখি যে বাগানের পাশের বড় রাস্তায় স্বয়ং মুশকিল আসান, অর্থাৎ মিথ্যে গল্পের ব্যাপারী আমাদের জগন্নাথ পণ্ডিত। যাক্ বাঁচা গেল। এখানেই নিশ্চয় আসছে।

কিন্তু এ কি, ও যে থামে না। কাঁধে ছাতা, হাতে লাঠি, পায়ে চপ্পল, বুড়ো এই অবেলায় এই গাঁয়ের পথে, হন্‌হন্ করে চ'লছে কোথায়? চীৎকার করে ডাকি, "জগুদা, ও জগন্নাথ দাদা, আরে ও জগাইদা, বলি শোনো, শোনো, এদিকে শোনো।"

ডাকটা কানে যেতেই লোকটা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চারদিক চেয়ে দেখতে লাগলো। আমিও তখন তাড়াতাড়ি ফটকের দিকে এগোচ্ছি। আমায় দেখে সে একেবারে হাসিমুখে বল্লো—"এই যে ভাই। আরে সঙ্গে ও কে, দিদিরানী যে!"

যা হোক, লোকটা এলো। জিগ্যেস করায় বল্লো পথে মোটর খারাপ হয়ে আটকে আছে, তাই সে চলেছে বারাসাত ডাকঘরে টেলিফোন করতে। আমি বল্লুম কিছুই করতে হবে না, আমার ড্রাইভার মিশির পাকা লোক। সে গাড়ি নিয়ে লোক নিয়ে মোটর টেনে আনুক এখানে, তার পর মোটর ঠিক করা হবে। জগুদা বল্লে—

"কিন্তু আমার যে কল্যাণী হরবোলা সঙ্ঘের জলসায় ভাষণ দিতে যেতে হবে।"

"আরে সে হবে এখন। আগে তো আমায় উদ্ধার কর। দিদিরানী চায় পরীর গল্প শুনতে তার কি হবে? আমার তো ও সবের কথা জানা নেই।"

"সে আর এমন কি বড় কথা? তুমি গল্প আরম্ভ কর যা হয় দিয়ে, পরে দেখো ঠিক নিজের থেকেই পরী এসে যাবে তার মধ্যে।"

"ব্যস্! বলে দিলে এক কথা। আমি বাঘের গল্প বল্লে তার মধ্যে পরী আসবে কি করে শুনি?"

"বেশ তো; তুমি আরম্ভ করো না। তুমি না পার তো আমিই ঠিক সময়ে পরী এনে হাজির করবো। বাঘ, পরী তুই-ই থাকবে গল্পে।"

দিদিরানী তো মহাখুশি। আমি আর কি করি, মিশিরকে জগুদার গাড়ির তদারকে পাঠিয়ে, চায়ের ব্যবস্থা করে, বসে গেলাম গল্প বলতে। শোন তবে গল্প।

বাঘের গল্প চাই, কিন্তু শিকারের কথা চলবে না। কি যে বলি ভাবছি এমন সময় মনে হলো কবিগুরুর নাতনী ভোলানো ছড়া। মনে মনে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে জোর গলায় বল্লাম।

"এক যে ছিল বাঘ।"

সঙ্গে সঙ্গে দিদিরানী মিষ্টি হাসি হেসে জিগ্যেস করলে:—

"তার নাম কি?"

কি বিপদ দেখ তো। ওদিকে জগুদা দেখি মুচ্‌কি হাসি হাসছে, আমার অবস্থা দেখে। আমি ভাবলাম, দাঁড়াও তোমায় জব্দ করছি। এই ভেবে বল্লাম:—

"ওই জগন্নাথ দাদা তাদের নাম ধাম জানে। ওকে জিগ্যেস করো।"

বলতে না বলতেই আমার জগাই পণ্ডিত গম্ভীর মুখে বল্লে :—

"বাঘের নাম গর্‌জন্ রায়। সোঁদর বনে মস্ত জমিদারী। ওরা দক্ষিণ রায়ের সেবাইত, বনেদী গুষ্টি। ওর ছেলের নাম তর্‌জন্ রায়। সেই যার গলায় হাড় আটকেছিল।"

দিদিরানী জিগ্যেস করলে "গলায় হাড় আটকালো কি করে?"

"খেতে বসে হাড়সুদ্ধু মাংস গিলেছিল, তাই গলায় আটকে গেল, যেমন মাছের কাঁটা গলায় বাধে।"

"ওঃ; ওর মা বুঝি হাড় বেছে দেয় নি?"

"না; ছেলে বড় হয়েছে বলে মা হাড় বেছে দিত না। শুধু খাবার সময় সুমুখে বসে থাকতো।"

"ওর মার নাম কি?"

"পাড়ার লোকে তাকে বলতো হুলুম ঠাকরুন। প্রজারা বলতো রায় বাঘিনী।"

"তার ছেলের গলায় হাড় আটকালো, তখন সে কি করলো?"

আমি এতক্ষণে দম ফিরে পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথের ছড়া মোড় ঘুরে বিদ্যাসাগরের কথামালায় গেছে দেখে তাড়াতাড়ি বল্লাম :—

"বকা ডাক্তারকে ডাকতে পাঠালো, হাড় বার করে দেবার জন্যে।"

"কে গেল ডাক্তার ডাকতে?"

আমি আবার রবীন্দ্রনাথের আসরে ফিরবার চেষ্টায় বল্লাম :—

"কেন ওদের ঝগড়ু বেয়ারা গেল।"

দিদিরানী আশ্চর্য হয়ে জিগ্যেস করলে, "সে আবার কেমন লোক, বাঘকে ভয় করে না?"

তাইতো! বাঘের ঘরে মানুষ চাকর, এও তো অদ্ভুত! রবীন্দ্রনাথ তো কিছু বলেও যান নি। আবার জগাইয়ের দিকে ফিরলাম। অমনি উত্তর এলো :—

"ঝগড়ু তো ভাল্লুক। তার দেশ গয়া জেলায় দানুয়া-ভালুয়ার জঙ্গলে। ও গরজন্ রায়ের বাপের আমলের বেয়ারা।" যাক্, ঝগড়ুর পরিচয় দেওয়া তো হলো। গল্প চালালুম তারপর।

"বকা ডাক্তার এসে বাঘের বেটার গলার হাড় বের করে দিয়ে গেল। তখন হোলো তর্জনের রাগের পালা। সে তার মাকে বল্লে—"আমি আর আসবনা তোমার কাছে খেতে।"

হুলুম ঠাকরুন বল্লেন, "কেন রে। রাগ করলি কেন?"

"তুমি হাড় বেছে দাও না কেন? আমি আর কখনো খাবোনা তোমার কাছে।"

"তা খাবিনে তো খাবিনে। মা ভাল নয় তো যা তুই বে করে বৌ নিয়ে আয় তার কাছে খাবিখন।"

"বৌ হাড় বেছে দেবে তো?"

"হ্যাঁঃ! বাঘিন্-বৌ হাড় মাংস নিজে খাবে না তোর জন্যে বসে বাছবে। আর কিছু না?"

"তবে বাঘিন্-বৌ আমি চাই না।"

"বাঘিন্-বৌ চাসনা তো যা তুই পরী-বৌ আন। সে খায় শুধু ফুলের মধু আর শিশিরের জল, মাংসের ওপর লোভ নেই। সে তোর জন্যে হাড়-কাঁটা বেছে দেবেখন।"

পরী-বৌ-এর কথা শুনে দিদিরানীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো। সে আনন্দে হাততালি দেবার যোগাড় করল। ওদিকে দেখি আমার জগাই দাদা ততক্ষণে কচুরী-নিমকি সন্দেশ-রসগোল্লা প্রায় শেষ করে এনেছে। পরীর কথা শুনে সেও আরেক ঢোক চা খেয়ে বল্লে :—

"দেখলে ভায়া, কেমন পরী নেমে এলো গল্পের মাঝে। আমি বলেছিলুম না, আরম্ভ করে দাও—"

দেখ তো লোকটার আক্কেল! বকে বকে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ, আর উনি একা তিন জনের জলখাবার সাবড়ে, দু'পেয়ালা চা পার করে, এলেন আমায় আপ্ত বাক্যি শোনাতে। আমি একটু গরম হয়েই বল্লাম, "পরী তো আনবে বলেছিলে তুমি। আমি তো কোনপ্রকারে তার খেই ধরিয়ে দিলাম। এবার যদি তুমি দয়া করো তবে আমিও একটু চা খাই।"

"বেশ, বেশ। শোন দিদিরানী তবে।"

বাঁচা গেল। এ মনগড়া কথার যোগাড় করা কি আমার পোষায়। এবার বকে মরুক ও। জগুদা আরম্ভ করলে :—

"পরী-বৌ-এর কথা শুনে তর্‌জন্ তখুনি বল্লে সে পরী-বৌ-ই চায়।" আর তখনি ডাক পড়ল ঝগড়ুর। "এ ঝগড়ু, ঝগড়ু"।

ঝগড়ু এসে দাঁড়ালো। হাতের খইনি, প্রকাণ্ড হাঁ করে মুখে নিয়ে বল্লে, "কা চাহি ঘোঁঘা?"

দিদিরানী আশ্চর্য হয়ে বল্লে "ঘোঁঘা আবার কি?"

"মানুষের ছেলেকে যেমন বলে খোকা, তেমনি বাঘের ছেলেকে বলে ঘোঁঘা। শোননি কথায় বলে বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা?"

"ও, তাই নাকি? তারপর?"

তারপর তর্জন্ ঘোঁঘা বল্লে "এই তুম জান্তা পরী-বৌ কাঁহা মিলতা ?"

যেই ঝগড়ু বলেছে, "হাঁ-আ, হম্ জানিত বা", অম্নি হুলুম্ ঠাকরুন বল্লেন, "হাঁ তুই তো সব জানিস। বলতো পরী তুই কোথায় দেখেছিস ?"

"আরে ওই জঙ্গল পারে যে ভারী বিল-ঝিল আছে, সেই ঝিলে লাখ-লাখ পদ্মো ফুল ভী ফুটে। পরী লোক সে ফুলের মধু খায়, নাচে গায়, হামি দেখ্লো পাঁচ সাত বার।"

"তুই বুঝি গেছলি মৌচাকের মধুর লোভে ?" তর্জন্ রায় ততক্ষণে লেজ খাড়া করে উঠে পড়েছে। সে বল্লে, "মা থামো তুমি। আমি এখুনি যাব পরী-বৌ আনতে। চল্ ঝগড়ু কোথায় তোর পদ্মে ভরা বিল"—

"আরে দাঁড়ারে ঘোঁঘা, তোর বাপকে বলে যা—" আর দাঁড়ায় কে, ততক্ষণে সে রওনা দিয়েছে জঙ্গলের দিকে, পেছনে চলেছে ঝগড়ু বেয়ারা।

অনেকক্ষণ চলবার পরে, বেলা যখন পড়ে এলো তখন জঙ্গলের ধারে এক মস্ত বিল দেখা গেল, সেখানে পদ্মবন। সেই পদ্মের মধুর লোভে অনেক মৌমাছি, প্রজাপতি আর কত সুন্দর সুন্দর ছোট পাখী উড়ে বেড়াচ্ছে !

বিলের ধারে এসে তর্জন্ চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ ঝগড়ু খাড়া হয়ে উঠে বল্লে "হো উধর দেখ্—"

তর্জন্ রায় গোল গোল চোখে চেয়ে দেখলো একটু দূরে, বিলের ধারে, পদ্মফুল আর পদ্ম পাতার মাঝে, পাঁচ ছয়টি পরী ঘুরে ঘুরে খেলে বেড়াচ্ছে। কী সুন্দর তাদের চেহারা আর কী সুন্দর

তাদের পরনের কাপড়-গয়না। বাঘের ছেলে তো হাঁ করে দেখতে লাগলো, তাদের মধু খাওয়া আর ছুটোছুটি খেলাধুলো।

এরি মধ্যে একটা দুষ্টু কুমীর তাদের ধরে খাবার জন্যে ডুবে ডুবে ভস্ করে উঠলো পদ্ম বনের মাঝে। উঠে প্রকাণ্ড হাঁ করে সে ধরতে গেল তাদের।

পরীরা তর্‌তর্ করে পদ্মপাতার ওপর ছুটে যে যার ডানা মেলে উড়ে গেল। শুধু তাদের মধ্যে যেটি সকলের চেয়ে সুন্দর আর বড়, সে ছুটতে গিয়ে একটু দূরে আটকে গেল পদ্মপাতায় শাড়ি কাপড়। কাপড় ছাড়াতে সে যতই ঝুটোপুটি করে ততই যেন আরো সে আটকে যায়, ওদিকে কুমীর এগিয়ে এলো হাঁ করে। ভয়ে পরীর রাজকন্যে কেঁদে উঠলো!

তার কান্না শুনে চমক্ ভেঙ্গে গেল ঝগড়ুর আর তর্‌জন্ রায়ের। ঝগড়ু হাঁক দিল—খবরদার।

তর্‌জন্ রায় বাঘের বাচ্ছা, সে গাঁ-আঁ-ওঁ বলে এক ডাক দিয়ে, প্রকাণ্ড এক লাফ মেরে পড়ল গিয়ে একেবারে সেই কুমীরের পিঠে।

আর তারপর কুমীরের ঘাড়ে মাথায় যা থাবড়া মারলো তার সেই বড় বড় ছোরার মত ধারালো নখসুদ্ধ থাবা দিয়ে, সে আর কি বলবো। কুমীর তো বিলের অথৈ জলে ডুব মেরে প্রাণ নিয়ে পালালো। আর বাঘ উঠল সাঁতরিয়ে ডাঙ্গায়।

ওদিকে কুমীর পালিয়েছে দেখে পরীর ঝাঁক এসে তাদের রাজকন্যেকে ছাড়িয়ে নিলো কাঁটার বন্ধন থেকে, আর তারপর সকলে ধীরে ধীরে পদ্মপাতার উপর পা ফেলে এলো এগিয়ে যেখানে ঝগড়ু, তর্‌জন্ রায়ের গায়ের জল মুছে দিচ্ছে।

পরীরা এসে শুধোলো, "আপনি কে, আমাদের রাজকন্যের প্রাণ বাঁচিয়েছেন ?"

ঝগড়ু বল্লে, "ইনি তর্‌জন্ রায়। এখানের ছত্রিস জঙ্গলী পরগণার মালিক গর্‌জন রায় বাহাদুর এঁর বাপ। আপনে লোক কে আছেন ?"

"আমরা ঐ সমুদ্দুরের মুখে মায়াদ্বীপের পরী। ইনি আমাদের রাজকন্যে, ছলনা এঁর নাম।"

ছলনা এগিয়ে এলো। ছোট দেখতে, দু'আড়াই হাত উঁচু বড়-জোর কিন্তু কি সুন্দর নিখুঁত গড়ন আর রং যেন দুধে আলতায়। রূপ তার ফেটে পড়ছে, আবার পরনের কাপড়-গয়নাও চোখ-ঝলসানো। এগিয়ে এসে সে তর্‌জন রায়কে বল্লে :—

"আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। বলুন আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি ?" কথার স্বরে সুরে যেন বাঁশির তান বেজে উঠলো।

বাঘের ছেলে তো এতক্ষণই হাঁ করে পরীর রূপ দেখছিল, তার কথা শুনে তার মনে সাড়া পড়ল। সে সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলো—

"আমায় বিয়ে করুন। আপনাকে বিয়ে করতেই তো আমি এসেছি এখানে।"

পরীর দল হেসেই গড়ালো। সে যেন শত রুপোর নূপুর বেজে উঠলো। কিন্তু ছলনা তাদের চুপ করিয়ে আবার বল্লে ঃ—

"সে কি করে হবে? আপনি হলেন বাঘ রাজার ছেলে আর আমি পরীরানীর মেয়ে। জাত-জন্ম গাঁই-গোত্তর সবই তো দু'-দিকেই অজানা।"

"তাতে কি হয়েছে, আপনি নাম ঠিকানা দিন, আমার বাবা সম্বন্ধ পাঠাবেন আর আপনার বাবা মা নিশ্চয়ই রাজী হবেন।"

ছলনা বল্লে, "আমাদের তো সম্বন্ধ করে বিয়ে হয় না, আমরা স্বয়ংবরা হই।"

"সে আবার কেমনতর ব্যবস্থা?" জিগ্যেস করলে বাঘ।

"তার মানে আমি সব জেনেশুনে দেখে যাকে পছন্দ করব, তার সঙ্গেই আমার বিয়ে হবে—"

"বেশ তো। আমার মত বর আপনি আর কোথায় পাবেন। আমার ক্ষমতা তো এখনি দেখলেন। আর শুনবেন আমাদের বংশ-গৌরবের কথা? ঝগড়ু বলতো সব—আরে সেটা গেল কোথা? ঝগড়ু, এ ঝগড়ু হো—"

আর ঝগড়ু! সে ততক্ষণে এদিক-ওদিক দেখে পাশের এক বুনো জাম গাছে চড়েছে। তার ওপরের ডালে বড় বড় আট দশটা মৌচাক। মধুর লোভে ঝগড়ুর জিভের জল টস্‌টসিয়ে গড়াতে লাগল। তাই সে আস্তে আস্তে সেই ডালটার দিকে উঠতে লেগে গ্যাছে। তার মনিবের ছেলের ডাক শুনে সে ফিরেও তাকালো না, শুধু বল্লে, "হুঁঃ, আওতবা—"

ছলনা বল্লে, "বংশ-পরিচয় না হয় পরে হবে। আপনার দুর্দান্ত ক্ষমতা তো এখনি দেখলুম। আপনার চেহারাতেও বেশ জলুস আছে। কিন্তু আপনার বিদ্যে-বুদ্ধি, কালচার এসব কেমন ?"

বাঘ বল্লে, "কালচার ? সে আবার কি ?"

"এই নাচ-গান-বাজনা ওই সব। আপনি নাচতে গাইতে পারেন ?"

"হাঁ-আ-আ! আলবাৎ পারি। দেখবেন আমার নাচ?" এই না বলে, তর্‌জন্‌ রায় আরম্ভ ক'রলো নাচ।

সে কি নাচ রে বাপ। এক এক বারে দশ বিশ হাত লাফিয়ে ওঠে, আর দুরমুশ পেটার মত দড়াম দড়াম করে মাটিতে পড়ে। দেখতে দেখতে সেখানের গাছপালা মড়্‌মড়িয়ে ভেঙ্গে একেবারে চিঁড়ে চ্যাপ্টা। সারা জঙ্গলে সাড়া পড়ে গেল, যেন শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই চলেছে। বিলের পাখী, জঙ্গলের জীব-জন্তু তো ভয়ে আড়ষ্ট। পরীর দলও সরে গিয়ে বিলের ভেতরে পদ্মপাতার ওপর দাঁড়ালো। ছলনার তো একেবারে ব্যাপার দেখে চক্ষু ইজ্‌ দি চড়ক্‌ গাছ! তার দলের পরীরা ভয়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছে দেখে সে বল্লে—

"থামুন, থামুন। নাচ তো দেখলাম, এবার গান শুনি"—সে কথা শুনে তর্‌জন্‌ রায় একগাল হেসে থেব্‌ড়ে বসে বল্লে, "একটু দম নিতে দিন, গান শোনাচ্ছি।" নাচ থেমে গেল, জঙ্গলের জীব-জন্তুরও ধড়ে প্রাণ ফিরে এলো, তারাও আস্তে আস্তে সটকে পড়ার পথ খুঁজতে লাগলো।

এতক্ষণ পরে আরম্ভ হোলো 'ঘঁ্যা-ও-র্‌র্‌, ঘঁ্যা-ও-র্‌র্‌' করে তান ভাঁজা—সে যেন দূরে মেঘ ডাকছে গুড়গুড় করে। পশু-পাখী সব আবার শিউরে উঠে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো।

হঠাৎ তর্জন রায় আকাশের দিকে মুখ তুলে, প্রকাণ্ড হাঁ করে ছাড়লো এক বিকট ডাক "গাঁ-আঁ-আঁ" সারা তল্লাট কেঁপে উঠ্‌লো যেন আকাশ ফাটা বাজ পড়ার মত সেই শব্দে। জন্তু জানোয়ার পশু পাখী তো চমকে ভড়কে পালালো, যে যেদিকে পারে। পরীর মেয়েরাও ডানা মেলে তর্‌তর্‌ করে পদ্মপাতার উপর দিয়ে ছুটে, হাওয়ায় ভর দিয়ে উড়ে গেল বিলের উপর দিয়ে, নীল আকাশে।

ওদিকে ঝগড়ু ধীরে ধীরে জাম গাছটার উপরের সেই ডালে, যেটিতে বড় বড় মৌচাক ছিল। সেও ঐ ভয়ানক শব্দে চমকে উঠল লাফিয়ে আর যেই লাফালো আর অমনি সেই ডাল ভেঙ্গে ঝগড়ু পড়ে গেল নিচে। সেই পড়ার মুখে ডালপালা ধরে সে প্রায় বিশ ত্রিশটা মৌচাকও ফেল্লে মাটিতে।

"যেই না মৌচাকগুলো ভেঙ্গে পড়েছে অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি ক্ষেপে যাকে পেলো কামড়ে হুল ফুটিয়ে জ্বালা ধরিয়ে দিলো।"

ঝগড়ু তো "হায় বাপ্‌! হো, রামা!" বলতে বলতে ছুটলো। হাজার দুই মৌমাছির কামড় খেয়ে তর্‌জন্‌ রায়ের পল্লী-বৌয়ের শখ মাথায় উঠলো, সে 'গাঁ-গাঁ' করে চেঁচাতে চেঁচাতে চল্লো বাড়ির মুখে ছুটেই—"

জগুদা এতদূর বলেছে এমন সময় মিশির এসে বল্লো, "বাবুজীকি গাড়ি ঠিক হো গই।"

ব্যস্‌, আর যায় কোথা; জগাইদা তো হাঁ-হাঁ করে উঠে দাঁড়াল। তারপর ছাতা লাঠি তুলে, "তবে আসি ভাই, জয় হোক দিদিরানীর" বলে এমন এক ছুট দিল গাড়ির দিকে, যেন সে মোগলসরাইয়ের পানিপাঁড়ে! ওদিকে দিদিরানীকেও ধরে নিয়ে গেল তার মা দুধ খাওয়াতে। নিমেষের মধ্যে সব ঠাণ্ডা!

এখন তোমরা, যারা এই গল্পটা পড়্‌লে, বলোতো আমায়, এই রকম আজগুবি সব বিনিয়ে-বানিয়ে লেখা কি আমার চলে?

নাঃ। আমি লিখিতো শুধু সত্যিই লিখব। এর পরের যে ক'টা গল্প তোমাদের দেব সে সব সত্যি, প্রায়—
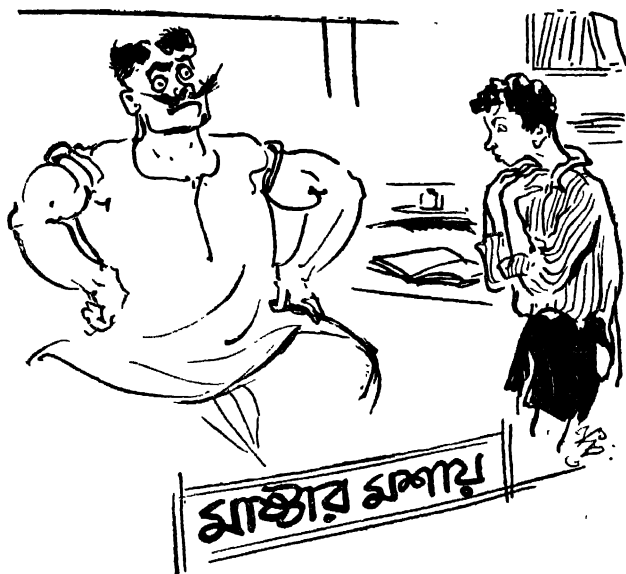
আজ তোমাদের একটি গল্প শোনাচ্ছি। শুনতে পাই তোমাদের খুশি করা নাকি খুব শক্ত কাজ। একদিন আমি তোমাদের বয়সীও ছিলাম। আমার সেই ছেলেবেলার একটি গল্প আজ তোমাদের কাছে বলছি। তোমাদের যদি খুশি করতে পারি তবে আনন্দ পাবো প্রচুর একথা আগে থেকেই বলে রাখছি। যদি কোন কারণে তোমাদের চটিয়ে দিই তাহলেও চট্ করে ভয় পাবার কিছু নেই—কেননা তোমাদের কাছ থেকে অনেকখানি দূরে বসে আছি। ইচ্ছে করলেই তোমরা দল বেঁধে আমায় পাকড়াতে পারবে না। তোমরা রয়েছ নানা জায়গায় ছড়িয়ে।

আমি আশা করছি, আমার ছেলেবেলার গল্প শুনে তোমরা বেশ খানিকটা আমোদ পাবে।

আচ্ছা, এইবার আসল গল্পটা সুরু করা যাক্। আমি একটু বেশী বয়সে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম, যদিও খুব ছোট বেলায় ইন্‌ফ্যাণ্ট ক্লাসে কিছুদিন পড়েছিলুম। আজকাল দেখতে পাই বাচ্ছা ছেলে-মেয়েরা খুব সকাল বেলা উঠে স্কুলের পথে পা বাড়িয়ে দিয়েছে। তোমাদের চাইতে তোমাদের বইগুলি ভারী। দেখে হাসিও পায় আবার দুঃখও হয়।

আমাদের ছেলেবেলায় কিন্তু এমন রাশি রাশি বইয়ের আমদানি ছিল না। যে কয়খানি বই পড়তে হতো—একেবারে আগাগোড়া সুন্দর করে তৈরী করে ফেলতে হত।

তখন আমার বয়স এগার বছর হবে। বাড়িতে পড়ি। এই সময় এলেন এক নূতন মাষ্টার। তাঁর চেহারা দেখেই আমার আত্মারাম একেবারে খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম।

ইয়া জঁাদরেল চেহারা—লোহার দুটো বল যেন তাঁর হাতের গুলি। তিনি ঢিলে হাতার পাঞ্জাবির আস্তিন গুটিয়ে মাস্‌ল্ ফুলিয়ে কেবলি সেগুলি আমার সামনে নাড়াতে লাগলেন, আর চোখ পাকিয়ে ভুরুটাকে জিজ্ঞাসার চিহ্নের মতো বেঁকিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন, "কি ? পড়া তৈরী থাকবে ত রোজ ?"

ততক্ষণ আমার গলা-বুক শুকিয়ে উঠেছে ; তেষ্টা পেয়েছে। এই কথা সাহস করে বলবো কি না আপন মনে ভাবছি— তিনি আবার হুমকি দিয়ে উঠে বল্লেন, "কৈ, ইংরেজী বই কোথায় দেখি !"

যেন আগুনে হাত দিচ্ছি সেই রকম ভয়ে ভয়ে অতি সন্তর্পণে আমার ইংরেজী পাঠ্যপুস্তকখানি এগিয়ে দিলাম। তিনি আড়চোখে আমায় আর একবার ভাল করে দেখে নিলেন। বলির ঠিক আগে

উৎসর্গ করা ছাগের দিকে খাঁড়া-ধারী যে ভাবে তাকায় অনেকটা সেই রকম বেপরোয়া ভাব।

মাষ্টার মশায়ের রকম-সকম দেখে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে, তিনি আমায় পড়াতে এসেছেন—না, একটা এসপার-ওসপার করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন।

ওইটুকু সময়ের মধ্যে ভাববার চেষ্টা করলাম—আজ সকালবেলা কার মুখ দেখে উঠেছি! কিন্তু চট্ করে কারো কথাই মনে পড়লো না। পৃথিবীটাকে অতি বেশি গোলাকার বলে বোধ হতে লাগলো। উত্তর ও দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা আছে কিনা সে কথাও সহসা ঠাহর হলো না।

এমনি যখন মনের অবস্থা, তখন আমার মুখে যেন কে বোবা-কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে। মাষ্টার মশায় যে মাঝে মাঝে বাঁকা চোখে আমার হাব-ভাব লক্ষ্য করেছেন—সেটা ওদিকে না তাকিয়েও বেশ বুঝতে পারলাম।

ইতিমধ্যে তিনি গম্ভীর ভাবে একটা শব্দ করলেন—"হুম! মন দিয়ে শোন এইবার!"

মাষ্টার মশায়ের হাতের গুলির নাচুনি, তার ওপর চোখের ভাবভঙ্গী এই দুই বস্তু চোখে দেখেও যদি মন দিয়ে না শুনি—তবে ভগবান আমায় রক্ষা করুন!

মাষ্টার মশাই বল্লেন, "একপাতা পড়া দিয়ে গেলাম। কোন

২

শব্দ আমার মুখ দিয়ে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে তার বানান আর অর্থ চট্‌পট্ বলে দিতে হবে। ধরো, কথাটা হল Surprise এই কথাটা যখনি আমি উচ্চারণ করবো অমনি তুমি বানান করে বলবে—S-U-R-P-R-I-S-E—তারপর বলবে তার মানে। আমি কিন্তু কিছু বলবো না—বানান করো কিম্বা মানে বলো !"

তারপর আর একবার আড়চোখে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন—"মনে থাকবে ?"

ছেলেবেলায় আমি খুব মুখচোরা মানুষ ছিলাম, তাই কথার কোন জবাব দিতে পারলাম না। শুধু ঘাড় কাত করে আমি যে বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছি সেই কথাই জানিয়ে দিলাম।

আমার নতুন মাষ্টার মশায় গম্ভীরভাবে আবার শুধু বল্লেন,"হুঁ !"

এইবার সেইদিনকার রাত্তিরের কথা বলি : শোবার আগে যতক্ষণ পারলুম পড়া মুখস্থ করলুম। কিন্তু বেশ বুঝতে পারলুম ভাল করে তৈরী হয়নি এবং এ জাতীয় তৈরীতে যে মাষ্টার মশায়কে খুশি করতে পারবো না সেটাও দুরু-দুরু বুকে কিছুটা আঁচ করতে পারলুম।

রাত্তিরে শোবার আগে বৌদিকে বল্লাম—খুব সকাল বেলা আমায় জাগিয়ে দিতে হবে। পড়া তৈরী করবো। তিনি পাঠ্য-পুস্তকে হঠাৎ আমার এরকম মনোযোগ দেখে বোধকরি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ঘুমুতে তো গেলাম···কিন্তু শুধু এপাশ-ওপাশ, এপাশ-ওপাশ ! ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি আমার চোখের পাতা থেকে ছুটি নিয়ে কোথায় যে লুকিয়ে রইল তার আর হদিস পাওয়া গেল না !

তারপর অনেক রাত্তিরে কখন আপনা থেকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সেটা ভালো করে খেয়াল করতে পারিনি।

কিন্তু বিপদের ওপর বিপদ!

সেই ঘুমের মধ্যেও স্বপ্ন দেখতে লাগলাম—মাষ্টার মশায়ের হাতের গুলি—তিড়িং-মিড়িং করে লাফাচ্ছে! চোখ দুটো ভাঁটার মতো জ্বলছে···সেই দুটো একেবারে যেন আমার কপালের ওপর ঝুঁকে পড়ে আমাকে বেশ করে দেখ্‌ছে!

কেমন একটা অসোয়াস্তিতে ঘুমটা আচম্‌কা ভেঙ্গে গেল। গায়ে হাত দিয়ে দেখি ঘামে একেবারে ভিজে গেছি! মাষ্টার মশায়ের মাস্‌ল্‌ যে ঘুমের মধ্যেও আমাকে তাড়া করেছিল বুঝতে পেরে সত্যি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম।

শেষ পর্যন্ত বৌদিদিকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে বসে শান্ত-সুবোধ ছেলের মতো পড়া তৈরী করতে লাগলাম।

বাড়িসুদ্ধ লোক আমার কাণ্ড দেখে তো একেবারে থ!

সারা সকালটা খেটে বেশ করে পড়া তৈরী করে ফেল্লাম। তারপর এসে হাজির হলো সেই সাংঘাতিক সময়। মাষ্টার মশায় এলেন—এলেন বল্লে ভুল বলা হবে—তাঁর শুভ আবির্ভাব ঘটল।

তিনি দিব্যি জাঁকিয়ে এসে বসলেন। পাঞ্জাবির আস্তিন বেশ করে গুটিয়ে নিলেন—যাতে মাংসপেশীগুলি চমৎকারভাবে চোখে পড়ে।

গম্ভীর গলায় হাঁক দিলেন, "বই নিয়ে এদিকে আয়।" কাঁদো কাঁদো চোখ আর দুরু-দুরু বুক নিয়ে হাজির হলাম তাঁর সামনে।

মাষ্টার মশায় একটি একটি করে শব্দ উচ্চারণ করতে লাগলেন —যেন বুলেট ছুঁড়ে মারছেন আমার দিকে।

প্রথমটা ভারী ভয় করছিল। মনে বল এনে জবাব দিতে লাগলাম।

কি আশ্চর্য! আমি নিজেই অবাক হয়ে যেতে লাগলুম! তিনি একটি একটি শব্দ বলে যাচ্ছেন আর আমি বানান করছি—অর্থ বলছি—

মজার কথা—একটুও আটকাচ্ছে না! ক্রমে ক্রমে নিজের যোগ্যতা দেখে নিজেই হক্‌চকিয়ে যাচ্ছি। এত ভাল পড়া তৈরী করেছি আমি!

মাষ্টার মশায়ের প্রশ্ন আর সঙ্গে সঙ্গে আমার জবাব। জবাব দেবার কাজ দিব্যি সুন্দরভাবে চলতে লাগলো। ক্রমে সমস্ত প্রশ্নেরই ঠিক জবাব দিলুম। নিজেকে নিজেই তারিফ করবো কিনা সেই কথাই ভাবছিলুম। হয়ত নিজের অজান্তেই মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল···আত্মতৃপ্তির হাসি হবে।

এমন সময় যেন বজ্রপাত হল। মাষ্টার মশায়ের এক বিরাট চপেটাঘাতে আমি একেবারে পপাত ধরণীতলে।

নাটকের ভাষায় এ যেন একেবারে অতর্কিত নৈশ আক্রমণ। এই রকম কাণ্ডটি যে ঘটবে তা এক মুহূর্ত আগেও জানতে পারিনি! এত জোরে চড় কখনো খাইনি, আর এত লেগেছিল যে এখনও মনে আছে।

মাটি থেকে যে উঠে বসবো সে ভরসাও ভাল করে করতে পারছিনে।

কিন্তু মাষ্টার মশায় আমাকে মাটিতে চুপচাপ শুয়ে থাকবার ফুরসত দিলেন না।

গম্ভীর গলায় তাঁর আদেশ শোনা গেল, "এইখানে উঠে আয়।"

আস্তে আস্তে উঠে গোবেচারীর মতো মাষ্টার মশায়ের সামনে দাঁড়ালাম।

তিনি গলাটা আরও সাফ করে আদেশের ভঙ্গীতে বল্লেন—

"এইবার বল দিকি কেন তোকে চড়টা মারলুম?" ভালো রে ভালো, এ যে দেখছি আরো বিপদ। চড় খেয়েও নিস্তার নেই।

—আবার ভালো করে বুঝিয়ে বলতে হবে, কেন আমি চড় খেলাম। আমার তখন গাল জ্বলে যাচ্ছে। কেন চড় খেলাম তার উত্তর আর আমার মগজে খুঁজে পাওয়া গেল না।

কাজেই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর উপায় কি?

কিন্তু মাষ্টার মশায় আমার ছাড়বার পাত্র নন। তিনি বল্লেন, —"বলতে পারলি নি তো কেন তোকে এই চড়টা মারলুম? তা হলে শোন্। "আজ তোর সমস্ত পড়া ঠিক হয়েছে বুঝতে পারছিস তো? যেদিন এই রকম পড়া ঠিক পারবি সেদিন সেদিন এই রকম অল্পের ওপর দিয়ে যাবে।"

তারপর হুঙ্কার দিয়ে বল্লেন—"আর যেদিন ভুল করবি সেদিন কি অবস্থা হবে বুঝতে পারছিস তো?"

এই বলে ছু'হাতের আস্তিন সমস্তটা তুলে নিয়ে মাস্‌ল্ ফুলিয়ে ছু'হাতের শক্ত করা মুঠি আমার নাকের কাছে ধরে চোখ লাল করে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

বলা বাহুল্য, তারপর তিনি যে তিন মাস আমায় পড়িয়েছিলেন, আমি একদিনও পড়া ভুল করিনি।

তোমাদের ভাল লাগবে কিনা জানিনে—তবে আমার ছেলেবেলায় এই ঘটনাটি যেদিন ঘটেছিল সেদিন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ভারী আমোদ পেয়েছিলুম—আজ অনেক দিন পরেও সে-কথাটা ভুলতে পারছি না।

তখন তোমাদের মত আমিও ইস্কুলে পড়ি। একটা লম্বা ছুটির অবকাশে দিনগুলি যেন আর কিছুতেই কাটতে চায় না। সকালে গল্প, তুপুরে গল্প, বিকেলে গল্প,···কত গল্পই আর করা যায়!

ছুটি যাপনের জন্য একটা নতুন প্ল্যান মাথা থেকে বের করতে হবে। আমার যারা সঙ্গী-সাথী, বন্ধু-বান্ধবের দল, তারা আর ভেবে ভেবে কূল কিনারা পায় না।

চিড়িয়াখানা দেখা, ম্যাচ দেখা, গড়ের মাঠে বেড়ানো···কিছুই যেন মনে দাগ কাটতে পারে না।

সেই সময়ে আমার এক মামা ছিলেন। তিনি অল্পের ভেতরেই বেশ জমিয়ে তুলতে পারতেন।

তিনি একদিন এসে হৈ চৈ করে প্রস্তাব করলেন, চলো, সবাই মিলে ক'দিন একটা বাগানবাড়িতে কাটিয়ে আসা যাক্—নতুনত্বও হবে আর সময়টাও কাটবে ভাল।

এক বন্ধু শুধোলেন, বাগানে ভূতের ভয় নেই ত?

শুনে মামা বল্লেন, এই সাহস নিয়ে তোরা দিগ্বিজয়ে বেরুবি?

বন্ধুটি ধমক খেয়ে সত্যিই ভড়কে গেলেন। তাঁর মুখ চোখ দেখে মনে হল—বাগানবাড়িতে ভূত যদি বা থাকে—তিনি কিছুতেই ভয় পাবেন না—একেবারে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছেন।

আর একটি বন্ধু জিগ্যেস করলেন, আচ্ছা, বেশ খোলা-মেলা জায়গা আছে বাগানবাড়িতে?

মামা জবাব দিলেন, জায়গা? একেবারে অঢেল ব্যবস্থা। ঘাসের ওপর শুয়ে থাকো, গাছের ডালে দোল খাও, বনের পথ দিয়ে ছুটোছুটি করো, বাগানবাড়ির ছাদে উঠে লাফালাফি করো, ডাব পেড়ে জল খাও—যা ইচ্ছে।

শুনে মনে হ'ল বন্ধুটি খুশি হয়েছে।

আর একটি বন্ধু এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলে, আচ্ছা মামাবাবু, পুকুর আছে বাগানবাড়িতে?

প্রশ্ন শুনে মামাবাবুও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। দুহাত দিয়ে প্রকাণ্ড একটা মাপ দেখিয়ে বল্লেন—প্রকাণ্ড বড় পুকুর—যত খুশি স্নান করো—সাঁতার কাটো—

কিন্তু বন্ধুটি নাছোড়বান্দা! সেইখানেই প্রশ্নটি থামিয়ে ইতি করে দিলে না বরঞ্চ আবার জিগ্যেস করে বসলো, আচ্ছা মামাবাবু

মাছ ! পুকুরে মাছ কি রকম আছে ? মানে বেশ খাওয়া-টাওয়া চলবে ত ?

সত্যি কথা বলতে কি মামাও ছিলেন একজন খাইয়ে লোক। তিনি উৎসাহে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে ডান হাতের কয়েকটি আঙুল দিয়ে, বাঁ হাতের চেটোয় একটা বিরাট থাবড়া মেরে গলাটা চড়িয়ে দিয়ে জবাব দিলেন—মাছ ? যত খুশি মেরে খাও। রুই, মিরগেল, চিংড়ি, কাতলা, কই। আরে পুকুরের মালিক একপুকুর মাছ জমিয়েছে—কারণ সে কাউকে জাল দিয়ে মাছ ধরতে দেয় না।

একজন জিগ্যেস করলে, তাহলে মামাবাবু আমরা ছিপে আর কটা মাছ ধরতে পারবো। তা ছাড়া, আপনি ছাড়া আমরা ত কেউ ছিপে মাছ ধরতে জানি না !

মামাবাবু বললেন,—আরে আমি জালেই ধরবো। মালী আর কতক্ষণ চৌকি দেবে। একটা মালীকে আর ফাঁকি দিতে পারবো না, সে তখন তোরা দেখবি।

এইবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়েই মনে হল—প্রত্যেক বন্ধুরই জিভে জল এসেছে। এখন একবার পাতে পড়লেই হয়।

একজন ভয়ে ভয়ে আর আস্তে আস্তে মামাকে জিগ্যেস করলো, আচ্ছা মামা, বাগানবাড়ির যে বর্ণনা দিলে—সেটি সত্যি আছে না তোমার মগজের কল্পনার মধ্যে বাসা বেঁধেছে ?

এইবার মামা একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বল্লেন, "ওরে শ্রীমানের দল, এই বাগানবাড়ির যিনি মালিক তিনি আমার বিশেষ পরিচিত। আমি মুখ ফুটে বলবার যা অপেক্ষা। কতদিন তিনি বলেছেন, বাগানবাড়িটা মিছি মিছি খালি পড়ে আছে—তোমরা গিয়ে দিন কয়েক কাটিয়ে এসো না—একেবারে দিলখোলা

মাটির মানুষ তিনি। আমি যদি আজই গিয়ে অনুরোধ করি তিনি আনন্দে আকাশের চাঁদ হাতে পাবেন।”

এরপর আর কোন রকম আপত্তির কথা ওঠে না। সুতরাং ছোট ছোট এক একটি ব্যাগে নিজের নিজের জামা কাপড় গামছা গুছিয়ে তৈরী করে নিলাম।

মামা সবাইকে ধমকে বলে গেলেন, “আর কিছু সঙ্গে নেবার দরকার নেই। রান্না বাড়ার সব কিছু সরঞ্জাম সেখানে মজুত আছে। এমন কি শোবার বিছানা-পত্রেরও নাকি অভাব নেই! পুকুরে মাছ গাছে ফল গোয়ালে দুধেলো গাই—ক্ষেতে শাক-সব্জী—একেবার স্বর্গরাজ্য প্রবেশের অধিকার বল্লেও চলে।”

তারপর সত্যিই একদিন পালে বাঘ পড়ল! মানে, আমরা সবাই দুর্গা শ্রীহরি বোলে, মামাকে পারের কাণ্ডারী ভেবে, সেই অদেখা স্বর্গরাজ্য—মানে আমাদের সেই বাগানবাড়ির উদ্দেশে পাড়ি জমালুম।

বাগানের যিনি মালিক তিনি মামার হাতে একটি চিঠি লিখে দিয়েছিলেন।

সন্ধ্যের মুখটাতে আমরা দলবল নিয়ে যখন বাগানের গেটের সামনে হাজির হলুম তখন বাগানের মালী যেন আমাদের একেবারে তেড়ে মারতে এলো।

সে যা বলতে চাইলে—তার মর্ম হচ্ছে এই যে স্বদেশী ডাকাত সে জীবনে অনেক দেখেছে, কাজেই সন্ধ্যের মুখে একদল অজানা-অচেনা লোককে সে কিছুতেই বাগানবাড়ির ভেতর ঢুকতে দেবে না। গভীর রাত্তিরে উঠে এই বাবুরা যে ডাকাতি করবার মতলব করেছে সে কথা সে বিলক্ষণ জানে। আর ওই ব্যাগগুলোর

মধ্যে যে বন্দুক ও বোমা লুকান আছে একথাও তার অজানা নয়।

মালীর বক্তব্য শুনে আমরা হাসবো কি কাঁদবো—ঠিক করতে পারলুম না।

আমাদের মামাবাবুর চোখ মুখ ততক্ষণে লাল হয়ে উঠেছে। রাগে তিনি কাঁপছেন। আমাদের এতগুলি বন্ধু-বান্ধবের সামনে এমন ভাবে বেইজ্জত হওয়া! অথচ তিনি ক্রমাগত আমাদের কাছে বলে বেড়িয়েছেন যে, বাগানবাড়ির মালিক তাঁর বিশেষ পরিচিত লোক এবং আমরা কয়েকদিন এখানে এসে থাকলে তিনি আনন্দিতই হবেন।

তার ভেতরে একি কাণ্ড! একেবারে পত্রপাঠ বিদায় করে দেবার মত অবস্থা! বাগানে ঢুকতে দিলে না হয় বলা যেত যে পরে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে! ঢুকতেই যেখানে দিচ্ছে না—সেখানে বের করে দেবার কথাই ত উঠতে পারে না।

তখন মামা সেই মালিকের চিঠিখানি বের করলেন। মনে হল মালী মালিকের চিঠির কাগজ চেনে। কেন না চিঠিটা দেখে সে বুঝতে পারলে যে, এটা খোদ মালিকেরই লেখা।

তখন আর আপত্তি করবার কোন উপায় নেই।

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে সে তখন বাগানবাড়ির ফটকটা খুলে দিলে। আমরা ভয়ে ভয়ে ভেতরে ঢুকলাম।

সেদিন রাত্তিরে আর খাওয়া দাওয়ার কোন সুবিধে হল না।

মামা কথায় কথায় মালীকে জিগ্যেস করলেন, "পুকুরে মাছ কেমন আছে?" মালী মুখখানা গম্ভীর করে জবাব দিলে, "কোথায় আর মাছ, বাবু! মাছদের মধ্যে মড়ক লেগেছিল—সব মাছ

কিছুদিন আগে মরে ভেসে উঠেছিল। তা ছাড়া আপনাদের আগেই বলে রাখি যে পুকুরে জাল ফেলা বাবুর বিশেষ বারণ আছে। একবার এক বাবুরা এসে জাল ফেলেছিলেন বলে আমার চাকরি যেতে বসেছিল। আপনারা কখনও পুকুরে জাল ফেলবেন না যেন।”

মালী সরে যেতে মামাবাবু ফিস ফিস করে বল্লেন, “আরে তোমরা বুঝতে পাচ্ছ না—ব্যাটা একা একা থাকে—নিশ্চয়ই মাছ বিক্রি করে পয়সা জমায়। এই যে দুটি জাল আমি সঙ্গে এনেছি এইতেই কাজ সারবো। আজ রাত্তিরটা ভাতে ভাত খেয়ে কাটিয়ে দাও। কাল দেখো কি কাণ্ড করি।”

মামাবাবুর যে কথা সেই কাজ। পরদিন আমাদের সবাইকে তিনি বল্লেন, “দেখ আজ এক পুকুর মাছ ধরতে হবে।”

আমরা অবাক হয়ে জিগ্যেস করি, “সেটা কি করে হবে মামাবাবু?”

মামাবাবু জবাব দেন, “দেখবি তোরা মজা এই দুটো জালই হবে আমার অস্ত্র। আর আমি যেমন যেমন বলবো, তোরা ঠিক সেই রকম করবি। ব্যাটা মালীকে

ফাঁকি দিতে কতক্ষণ লাগে?”

ছুটো জাল নিয়ে মামা সদর্পে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। প্রথমে একটা জাল ঝপাং করে পুকুরের জলে ফেলে দিলেন তারপর আর একটা জাল সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে দিলেন, পুকুরের পাশের মাঠ-টাতে। মালীর ঘরটা পুকুরের পাড় থেকে গাছের আড়ালে ছিল। জাল ফেলার শব্দ শুনে মালী তেড়েমেড়ে ধেয়ে এলো। আমাদের কাছে এসে রেগে মেগে বল্লে—"বারণ করা সত্ত্বেও আপনারা পুকুরে জাল ফেলেছেন!"

মামাবাবু মাঠে ফেলা জালটাকে দেখিয়ে মালীকে বল্লেন, "আরে না, না, মালী জালটা কি করে ফেলতে হয় আমি শুধু সেই কায়দাটা শিখে নিচ্ছি।"

মালী চেয়ে দেখলে, সত্যিই জালটা মাঠের মাঝখানে ঘাসের ওপর বিছানো আছে, আর সেটা শুকনো। কাজেই মুখ ফুটে কিছু আর বলতে পারে না। আপন মনে গজ্ গজ্ করতে করতে নিজের ঘরে চলে গেল।

তখন মামা পুকুরে ফেলা সেই জালটাকে আস্তে আস্তে তুলে দেখালেন—প্রচুর মাছ উঠে এসেছে তার ভেতর। আর তখনই আমরা সেই মাছ চুপি চুপি বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলুম।

তারপরে মামাবাবু ফের যেই জাল ফেলেছেন আবার মালী ছুটে এলো, আর মামাবাবু ফের সেই মাঠে ফেলা শুক্‌নো জালটা দেখিয়ে দিলেন। এবারে ইচ্ছে করে মামাবাবু মাঠে ফেলা জালটা একটু অন্য রকম করে রেখেছিলেন। যাতে মালীর বিশ্বাস হয় যে এই জালটা আবার ফেলা হয়েছে।

মালী বুঝতে পারে না, আসল ব্যাপারটা কি হচ্ছে। অথচ একটা কিছুর আশঙ্কা করে ক্রমাগত ঘর বার করতে থাকে।

এইভাবে দুটো জালের কসরতে মামা বিস্তর মাছ তুলে ফেল্লেন, আর আমরা সেগুলো সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে রেখে এলুম।

মামাবাবু আমাদের কাছে গর্বভরে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন অক্ষরে অক্ষরে তিনি সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন।

রাত্তিরে সেদিন যে ভোজ হয়েছিল তা আমাদের আজও মনে আছে।

অনেক সময় টেলিফোনে খুব মজার মজার ঘটনা ঘটে। সে রকম দু-একটা ঘটনা আমি আজ বলব। যা বলছি তা সম্পূর্ণ সত্য, কেবল পাত্রপাত্রীদের নামগুলো বদলে দিচ্ছি যাতে কেউ মনঃক্ষুণ্ণ না হন।

কোন এক সমিতির এক সেক্রেটারী ছিলেন, তিনি প্রায়ই আমাদের আপিসে আসতেন। ভয়ানক তোত্‌লা লোক। আমাদের তখন বয়স কম। তাঁর কথা শুনলেই খুব হাসি পেত, কিন্তু পাছে তিনি রাগ করেন বা দুঃখিত হন, সেজন্য প্রাণপণে তাঁর কাছে আমরা গম্ভীর হয়ে থাকবার চেষ্টা করতুম। কিন্তু একদিন ধরা পড়ে গেলুম।

সেদিন তিনি আমাকে বল্লেন, (অবশ্য তিনি যেভাবে কথা

বলতেন সেই ভাবে) "দেখ, এই নম্বরটা ফোনে ডাকত, বিশেষ দরকারী কাজ আছে।" আমি সেই নম্বরটা ফোনে চাইলুম, কিন্তু অপারেটার একটা ভুল নম্বর দিলে। আমি আবার আসল নম্বরটা চাইলুম কিন্তু কি কারণে জানিনা নম্বরটা পেতে একটু দেরী হ'তে লাগল। কমলবাবু একটু অধৈর্য ধরনের লোক ছিলেন, একটুতেই হঠাৎ রেগে যেতেন। কনেক্সন পেতে দেরী হচ্ছে দেখে তিনি ফট্ করে আমার হাত থেকে টেলিফোনটা কেড়ে নিলেন। এইবার বাধলো মুশকিল!

এক্সচেঞ্জ জিজ্ঞাসা করলো, "নম্বর প্লিজ"। কমলবাবু উত্তর দিলেন, "টু-টু-টু-টু-টু-টু-টু-টু"···(যদিও আমি একতরফা কথাবার্তা শুনছি, কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে আমার কোন অসুবিধা হ'ল না) কমলবাবু 235 নম্বরটি চাইছিলেন। কিন্তু টুয়েতেই তিনি গেলেন আটকে। তারপর কথাবার্তা চললো এইভাবেই।

কমলবাবু—"আরে না না, নট ডবল টু ডবল টু...ওনলি ওয়ান, ওয়ান, ওয়ান, ওয়ান, ওয়ান,....টু-টু-টু-টু-টু-টু। আরে নো নো, নট ডবল ওয়ান—ডবল ওয়ান। ওনলি ওয়ান, ওয়ান, ওয়ান, ওয়ান, ওয়ান, ওয়ান, টু-টু-টু-টু-টু"—কমলবাবু বলতে চাইছেন যে, ডবল টু, ডবল টু নয়; শুধু একটা টু। কিন্তু মুশকিল হয়েছে যে, ঐ একটা টু বোঝাতে গিয়ে অনেকগুলি ওয়ান এবং অনেকগুলি টু বলছেন। তিনি চাইছিলেন টু, থ্রী, ফাইভ, কিন্তু টু নিয়েই দশ মিনিট ধ্বস্তাধ্বস্তি, থ্রী অবধি আর পৌঁছুতে পারলেন না। বলাই বাহুল্য, সে দিন আর আমি গাম্ভীর্য রাখতে পারিনি, তাইতে তাঁর এমন রাগ হল যে, তাঁর গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেল। তিনি খট করে টেলিফোন নামিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বিচিত্র কাহিনী

আমার এক সম্পর্কে দাদা ছিলেন। তাঁর সাংসারিক জ্ঞান ছিল বড়ই কম, যদিও তাঁর স্বভাব ছিল অত্যন্ত সরল। তিনি নিজে ছিলেন ডাক্তার এবং তাঁর একজন ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে ফোনে প্রায়ই কথাবার্তা বলতেন। তাঁদের এই দুই ফ্যামিলীতে খুব হৃদ্যতা ছিল এবং দুই পরিবারের মহিলাদের মধ্যেও আলাপ-পরিচয় ছিল। তিনি আপিসে এসে আমাকে বলতেন, "একবার ডাক দিকিনি গোলাপ ডাক্তারকে।" আমি কনেকসন করে দিলে তিনি কথাবার্তা আরম্ভ করতেন এবং প্রায় আধ ঘণ্টার আগে টেলিফোন ছাড়তেন না। এই সময়ের মধ্যে তাঁর সংসারের গুহ্য কথাবার্তা বলে তবে ছাড়তেন।

একদিন তিনি নিজেই টেলিফোন করতে গেলেন এবং তাতেই ঘটলো বিভ্রাট। টেলিফোনের রিসিভার কানে দিতেই অপারেটার বল্লে "নম্বর প্লিজ"। আমার দাদা এদিকে গেছেন নম্বরটি ভুলে। তিনি বললেন, টু, সেভেন, এইট, বলেই বাকী অঙ্কটি মনে না পড়াতে টেলিফোনের বইটা খুলে নম্বরটা খুঁজতে লাগলেন— মিনিটখানেক বাদে বল্লেন, "থ্রী" (তিনি চেয়েছিলেন টু, সেভেন, এইট, থ্রী)। অপারেটার এদিকে তাঁকে টু, সেভেন, এইট-এর সঙ্গে ততক্ষণে কনেক্সন করে দিয়েছে। এবার কথাবার্তা আরম্ভ হ'ল এই ভাবে—আমার দাদা বলছেন—"কে গোলাপবাবু নাকি, তারপর কি হয়েছে শুনুন—"

ভুল নম্বরের লোক—আপনি কাকে চান মশায় ?

দাদা—আরে শুনুন না মশাই, আপনার ম্যালেরিয়ার ব্যাপারটা—

ভুল নম্বরের লোক—আরে কাকে চান বলুন না ?—

দাদা—আপনাকেই চাইছি গোপালবাবু। গজুর মা (গজু তাঁর ছেলে) কি করেছে জানেন—

এইভাবে কথাবার্তা চল্লো আর বাড়ির সমস্ত গুহ্য কথা তিনি তাকে বলতে লাগলেন।

প্রায় পাঁচ মিনিট বাদে প্রকাশ হ'ল যে, তিনি ভুল লোকের সঙ্গে এতক্ষণ কথাবার্তা কইছিলেন।

আমার দাদার হলো ভীষণ রাগ। তিনি অপর পক্ষকে বল্লেন, "আপনি কি রকম লোক মশাই, আমার ফ্যামিলি secret শুনছেন ? আগে কেন বল্লেন না যে আমি গোলাপ ডাক্তার নই ?"

ভুল নম্বরের লোকটি বল্লেন, আমার কি দোষ মশাই, আমি যতবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আপনি কি নম্বর চান, আপনি আমাকে কেবল দাবড়ানি দেন ও আপনার ঘরের কথা বলতে থাকেন। এতে আমার দোষটা কি বলুন ?" (অবশ্য অপর পক্ষের এই কথাগুলি আমি পরে দাদার কাছেই শুনেছিলাম) ?

আমাদের আপিসের এক ডিপার্টমেণ্ট-এ দু'জন সিনিয়ার কর্মচারী ছিলেন। তাঁদের একদিন টেলিফোনে ঝগড়া হয়। এঁদের একজন কানে কম শুনতেন এবং অপর লোকটির কথা বলার সময় মধ্যে মধ্যে মুশকিল হ'ত, তবে ইনি ঠিক তোত্‌লা নন। বেশ কথা বলে যাচ্ছেন, হঠাৎ একটা কথায় এমন আটকে গেলেন যে দম বন্ধ হবার যোগাড়। একদিন আমি এঁর আপিস ঘরে

ঢুকে দেখি তিনি টেলিফোন কানে দিয়ে চুপ করে আছেন। আমি গোড়ায় ভাবলুম তিনি অপর পক্ষের কথা শুনছেন, কিন্তু তার পরেই তাঁর মুখ চোখের ভাব দেখে বুঝলুম তিনি কি একটা কথা বলবার চেষ্টা করছেন। একটু পরেই তিনি বল্লেন, 'Propaganda' এবং হঠাৎ রেগে টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে বল্লেন, "বয়রাটা (কালা) বড়ই জ্বালালে!" আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, "কি হয়েছে!" তিনি বল্লেন, "দেখলে না, আমি কত চেষ্টা করে ঐ কথাটা বল্লুম, (তিনি 'Propaganda' কথাটা আর একবার উচ্চারণ করবার চেষ্টা করলেন না) আর বয়রাটা বলে কিনা 'কি বল্লে, আবার বল'—দেখ দিকিনি একবার অত্যাচারটা।"
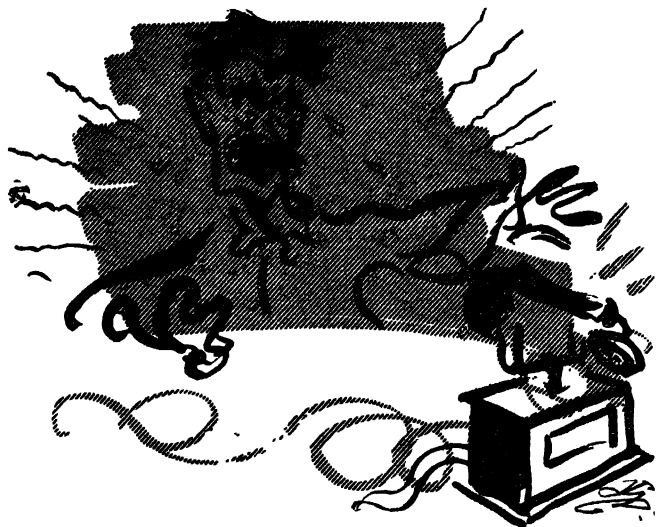
কাগজের সম্পাদকদের অনেক সভায় সভাপতিত্ব করতে হয় এবং এর জন্য অনেক সময় খুব মুশকিলে পড়তে হয় এই সব সম্পাদকদের। এক এক সময় এমনও হয়ে পড়ে যে, ভদ্রলোকদের অনুরোধ এড়াতে না পেরে একদিনেই হয়ত দু'তিনটি সভাতে সভাপতিত্ব করতে হয় তাঁদের। কিন্তু এই সব দিনে এক সভার কাজ ঠিক সময়ে শেষ করতে না পারলে অন্য সভায় যাওয়ার ব্যাপারে মুশকিল বাধে। কিন্তু কোন কোন সভার উদ্যোক্তাগণ মিটিং করার ব্যাপারে উৎসাহী হলেও সময়ের (punctuality) মূল্য বোঝেন না, আর তাতেই সভাপতিদের পড়তে হয় বিপদে। একবার আমাকে এই রকম এক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে কি রকম বিব্রত হতে হয়েছিল সেই গল্পই এখানে বলছি।

—পশ্চিমের এক শহরে সেবার বেড়াতে গেছি। যেমন সব

জায়গাতেই থাকে, সেখানেও তেমনি বাঙালীদের একটি লাইব্রেরী ছিল। আমি সেখানে এসেছি শুনে, স্থানীয় লাইব্রেরীর কর্তারা আমার সঙ্গে দেখা করে একটা তারিখ জানিয়ে অনুরোধ করলেন যে, ঐ দিন বৈকালে আমি যেন তাঁদের লাইব্রেরীর বাৎসরিক সভায় পৌরোহিত্য করি। কিন্তু তার আগেই আমি ঐ দিন সাড়ে ছ'টার সময় স্থানীয় লোকদের আর একটি সভায় সভাপতিত্ব করব ব'লে কথা দিয়েছিলুম, কাজেই তাঁদের কাছে আমি বিনয় সহকারে বল্লুম যে, "একই বৈকালে দুটো সভার কার্য করা সমীচীন হবে না—অতএব তাঁরা যেন আমাকে ক্ষমা করেন।"

এ কথা শুনে তাঁরা উত্তেজিত হয়ে বল্লেন, "কেন মশায়, আমাদের সভা না হয় পাঁচটায় করব, আর তাদের ত সাড়ে ছ'টায়—এতে আর আপনার অসুবিধেটা কি? এখানে ঘণ্টাখানেক থেকে ওখানে চলে যাবেন।" আমি বল্লুম, "যদি আপনাদের সভায় দেরী হয় তাহলে কি হবে? ওঁরা বসে থাকবেন আমার আশায়, আর আমার মুণ্ডপাত করবেন। আপনারা বাঙালী, আপনাদের কাছে পার পেলেও, ওঁদের কাছে হয়ত পার পাব না!"

এই কথার পর লাইব্রেরীর সেক্রেটারী বল্লেন, (যিনি ওঁদের হয়ে প্রধানতঃ আমার সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন) "আপনি বলেন কি স্যার, আমাদের কি কাণ্ডজ্ঞান নেই? আমরা ঠিক পাঁচটায় সভার কাজ আরম্ভ করব এবং এক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ করে দেব। শুধু রিপোর্ট পড়া, আপনার স্পীচ ও সভাপতিকে ধন্যবাদ দেওয়া। এতে আর কত সময় লাগবে? দেখবেন, এখানকার কাজ শেষ করে আপনাকে ও সভায় গিয়ে শেষ পর্যন্ত বসে থাকতে হবে।" কি করি, শেষ পর্যন্ত নিজে বাঙালী হয়ে

প্রবাসী বাঙালীদের জেদাজেদিতে রাজী হতে হ'ল। তবে আমি তাঁদের বল্লুম যে, "দেখবেন 'মশায়, আমায় যেন ডোবাবেন না। আমি ঠিক পাঁচটায় হাজির হব।"

এইবার শোন বিপত্তির কথা। দেখতে দেখতে মিটিঙের দিন সকাল পাঁচটার কাঁটা বিকেল পাঁচটার কাছাকাছি এসে পড়ল। আমি প্রস্তুত হয়ে সাজগোজ করে ঠিক পাঁচটার সময় লাইব্রেরীতে এসে উপস্থিত হলুম। কিন্তু এ কি! এ যে সব ভোঁ ভাঁ—কেউ কোথাও নেই! শুধু তাই নয়, লাইব্রেরীর দরজায় তালা দেওয়া। বিস্ময়ের আর অবধি রইল না আমার। একবার ভাবলুম, এ কি রকম হ'ল—আমি কি দিন ভুল করলুম, না ঠিকানা ভুল করলুম, না ভদ্রলোকেরা আমার সঙ্গে রসিকতা করলেন! তখন আর কি করি, লাইব্রেরীর পাশের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলুম যে, আমার কোন ভুল হয়নি, আমি ঠিক দিনে ঠিক জায়গাতেই এসেছি। ততক্ষণে কিন্তু পাঁচটা বেজে কুড়ি মিনিট হয়ে গেছে। আমি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লুম এবং অসোয়াস্তি অনুভব করতে লাগলুম। এই সময় আমার মনে হ'ল, সেক্রেটারীর বাড়ি গিয়ে একবার নিজেরই জানা দরকার যে ব্যাপারটা কি। পাশের বাড়ির ভদ্রলোকের কাছ থেকে সেক্রেটারীর বাড়ির ঠিকানাটা জেনে নিয়ে গাড়ি করে যাত্রা করলুম তাঁর কাছে।

যথাস্থানে গিয়ে দেখি যে, একটি একতলা বাড়ি, ভেতর থেকে তারও দরজাটা বন্ধ। আমি দরজায় ধাক্কাধাক্কি করাতে দরজা খুলল এবং দরজা খুলেই যা দেখলুম তাতে আমার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। দেখলুম, আমার সামনে সেক্রেটারী মশায় দাঁড়িয়ে—তাঁর খালি গায়ে সর্বাঙ্গে তেল গড়াচ্ছে, আর পরনে একটা ছোট

গামছা। নাইকুণ্ডল সমেত ভুঁড়িওয়ালা তলপেটটা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

আমাকে দেখেই তিনি সহজভাবে বল্লেন, "এই যে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন দেখছি। মাথায় দু'ঘটি জল ঢেলেই এখুনি আসছি।" আমি বল্লুম, "তা যেন এলেন, কিন্তু আপনার বাকী মেম্বাররা কোথায়? কাউকে ত দেখতে পেলুম না।" তার উত্তরে তিনি বল্লেন, "সব এসে জুটবে 'খন, কোন ভয় নেই।" আমি বল্লুম, "বলেন কি আপনি? এদিকে যে পৌনে ছ'টা বাজে! তার চেয়ে বরং এক কাজ করুন, আপনি আমাকে মেম্বারদের নাম ও তাঁদের ঠিকানা দিন। আমিই বরং তাঁদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধরে নিয়ে আসি আর আপনি এদিকে আপনার স্নান সেরে নিন।" এ কথা শুনে একটু বিব্রত বোধ করে তিনি বল্লেন, "আরে না না, তাও কি কখনো হয়—কোথায় আপনি তাদের খুঁজতে যাবেন? তার চেয়ে বরং এক কাজ করুন, লাইব্রেরীর চাবিটা নিয়ে যান, আর ঘরটা খুলে একটু অপেক্ষা করুন, সব আপনিই এসে সুড়সুড় করে হাজির হবে এখুনি।"

কি করি অগত্যা তাতেই রাজী হয়ে লাইব্রেরীর চাবিটা নিলুম তাঁর কাছ থেকে, তারপর সেখানে গিয়ে ঘরটা খুলে অপেক্ষা করতে লাগলুম। কিন্তু কারুর দেখা সাক্ষাৎ নেই। বারবার ঘড়ি দেখতে লাগলুম। ক্রমে ছ'টাও বেজে গেল। আর স্থির থাকা সম্ভব নাকি ? অসোয়াস্তির সঙ্গে ভাবতে লাগলাম কি করা যায়। এখনই না বেরোলে ত অপর সভায় ঠিক সময় পৌঁছুতে পারব না। আর এদিকে এ সভা আরম্ভই বা হবে কখন আর শেষই বা হবে কখন ! শেষ পর্যন্ত আমি আর বসে থাকতে না পেরে উঠে পড়লুম, তারপর লাইব্রেরীর চাবিটা পাশের বাড়ির ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে খানিকটা রেগেমেগেই অপর সভায় চলে গেলুম।

পরদিন সকালে চা খেয়ে বারান্দায় বসে বসে ভাবছি ঃ আজ নিশ্চয়ই লাইব্রেরীর কর্তারা আসবেন দেখা করতে—তখন তাঁদের কি বলবো। ভদ্রলোকদের ত আর যা-তা বলা যায় না। এই সব সাত-পাঁচ ভাবছি এমন সময় সত্যিসত্যিই তাঁরা এসে হাজির হলেন। মনে হ'ল এ ব্যাপারে তাঁরা খুব লজ্জিত হয়ে নিশ্চয় আমার কাছে মাফ চাইবেন। অনুমানটা আমার একেবারে মিথ্যে হয়নি, মাফ অবশ্য তাঁরা চাইলেন বটে, কিন্তু মাফ চাওয়ার চেয়ে ভর্ৎসনাই করলেন যেন ঢের বেশী। সেক্রেটারী মশায় যা বল্লেন, সংক্ষেপে তা হচ্ছে ঃ "আপনি চলে আসার পরেই আমরা সকলে এসে হাজির হয়েছিলুম, আর একটু অপেক্ষা করলেই পারতেন।" আমি বল্লুম, "আপনারা মিটিং-এর কথা পাঁচটায় বলেছিলেন, না ?" একথা শুনেই ওঁদের সঙ্গের এক বুড়ো ভদ্রলোক উঠলেন ভীষণ চটে। উত্তেজিত হয়ে তিনি বল্লেন, "আপনি কি রকম লোক মশায় ? একটা কমন্ সেন্স (Common sense) নেই ? পাঁচটা অবধি ত' আপিসই

সবার· ·তারপরে লোকে বাড়ি যাবে, মুখ-হাত ধোবে, জলখাবার খাবে, কাপড়-চোপড় বদলাবে, তবে ত মিটিং-এ আসবে···এত বড় কাগজ চালান আর এটুকু আপনার মগজে ঢোকে না !"···

আমি আর কি বলবো ? তাঁদের কাছে মাফ চেয়ে বল্লুম, "একটু চা-টা খান।"

তাঁরা খুব গম্ভীর ভাবে চা আর জলখাবার খেয়ে এক রকম রাগ ক'রেই চ'লে গেলেন।

*　　　*　　　*

আর একবার অনেকদিন আগের কথা। কলকাতা থেকে ১৫।১৬ মাইল দূরে আমন্ত্রিত হয়েছি একটা অনুষ্ঠানে। আমি আর নলিনীরঞ্জন সরকার মশাই। নলিনীবাবু প্রধান অতিথি আর আমি সভাপতি। কিন্তু ক'লকাতায় একটা জরুরী ডিনারের নেমন্তন্ন আছে আমাদের উভয়েরই। ঠিক সন্ধ্যা আটটায় সেই ডিনারে উপস্থিত না থাকতে পারলে, অনুষ্ঠানের দিক দিয়ে তো বটেই—কাজের দিক দিয়েও আমাদের খুব ক্ষতি হবে।

কাজেই কলকাতা থেকে ১৫ মাইল দূরের সেই অনুষ্ঠান-কর্তাদের বার বার করে সাবধান করে দিয়েছি যে, যেমন করেই হোক্ সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে সে উৎসব শেষ করতেই হবে।

অনুষ্ঠান হচ্ছে একটা স্পোর্টস-এর ব্যাপার। আমার ধারণা ছিল স্পোর্টস-এর সভায় আর কত সময় লাগবে ? শুধু পুরস্কার-গুলি বিতরণ করবার কাজে যেটুকু দেরী হতে পারে। সভাপতি আর প্রধান অতিথির ভাষণ ছোটবড় করা আমাদের নিজেদের হাতে। হাতে রয়েছে ঘড়ি, সেইমত ব্যবস্থা করলেই চলতে পারবে।

কিন্তু ওখানে পৌঁছে যা দেখলুম—তাতে চক্ষু চড়কগাছ হবার মত। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা আয়োজন করেছেন রাশি রাশি গান, আবৃত্তি আর বক্তৃতা। ছোট মেয়েদের নাচও আছে। কাকে বাদ দি? যাঁর বিষয়টি কেটে দেবো, তিনিই মনঃক্ষুণ্ণ হবেন। কিন্তু এ-ও সত্যি কথা যে আমাদের সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে উঠতেই হবে। নইলে সব মাটি।

তখন আমি একজন কর্মকর্তাকে ডেকে সভাপতি হিসেবে ফতোয়া জারী করলুম যে, ছোটদের নাচ-গান-আবৃত্তি চলুক, কিন্তু বক্তৃতা একেবারে বন্ধ রাখতে হবে। বক্তৃতা দেবেন শুধু সভাপতি আর প্রধান অতিথি। আমাদের প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝে উৎসবের কর্মকর্তা তাতেই রাজী হলেন।

সুরু হোল উৎসব। ছোটদের নাচ-গান-আবৃত্তি ইত্যাদি বেশ চলতে লাগলো। ওদের বিষয়গুলি সুন্দর আর উপভোগ্য ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আশেপাশে তাকিয়ে দেখি অনেকেই উস্‌খুস করছেন—গলা খাঁকারি দিচ্ছেন!

তার মানে আর কিছুই নয়—বক্তৃতা দেবার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন কিন্তু এখানে এসে সভাপতির ফতোয়ার কথা শুনে সবাই বিলক্ষণ দমে গেছেন! আমি কিন্তু সভাপতি হিসেবে একেবারে অচল অটল! নিজের ঘোষণা থেকে একচুল এদিক ওদিক হচ্ছি না।

নলিনীবাবুকে বল্লুম, "আপনি এইবার প্রধান অতিথির ভাষণ সংক্ষেপে সেরে ফেলুন। তারপর আমিও সভাপতির ভাষণ অল্পেতেই শেষ করে দেবো।"

নলিনীবাবু সহজেই রাজী হলেন, কেননা আমার মতন তাঁরও ফেরবার তাগিদ রয়েছে।

নলিনীবাবুর বক্তৃতাও নির্বিঘ্নে সমাধা হোল। আমি কিছু বলতে উঠবো, এমন সময় উদ্যোক্তাদের মধ্যে থেকে এক মুন্সেফ ভদ্রলোক আমার কানে কানে এসে বল্লেন, "দেখুন, সভাপতিকে ধন্যবাদ দেবার ভার পড়েছে আমার ওপর। কিন্তু একটা বিশেষ জরুরী কাজে আমাকে এক্ষুণি চলে যেতে হচ্ছে। শুধু দু' মিনিটে আমি ধন্যবাদের পালা শেষ করে চলে যাবো, দয়া করে আমাকে এই অনুমতি দিন।"

ভদ্রলোকের কাতরোক্তিতে আমি বিগলিত হলুম—এবং তাঁকে দু'মিনিট কিছু বলবার জন্য অনুমতি প্রদান করলুম।

কিন্তু কি আশ্চর্য! সভাপতিকে ধন্যবাদ দিতে উঠে তিনি প্রথমেই সাড়ম্বরে ঘোষণা করলেন যে, এইমাত্র আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতিমশাই যে সুচিন্তিত ভাষণ প্রদান করলেন তার তুলনা হয় না।

আমি তো শুনে অবাক। ভদ্রলোকের জামা ধরে টেনে ফিস্‌ফিস্ করে বল্লুম, "আরে মশাই আপনি করছেন কি? আমি তো সভাপতির ভাষণ এখনও দিইনি। আপনি কি করে আগে থেকেই বলতে পারছেন যে, আমার বক্তৃতা খুব সুচিন্তিত হয়েছে?" তাতে তিনি ভগবান বুদ্ধের আশ্বাসবাণীর মত হাত তুলে জবাব দিলেন, "আরে আপনি যে সুচিন্তিত ভাষণ দেবেন—এতো আমার জানা কথাই। শুধু আমাকে একটু তার প্রশংসা করতে দিন।"

এই বলে তিনি বিশেষণে-বিশেষণে সভাপতির ভাষণের প্রশংসা করে আমাকে একেবারে সপ্তম-স্বর্গে নিয়ে হাজির করলেন।

তাঁর এই কাণ্ড দেখে আমি হাসবো কি কাঁদবো বুঝে উঠতে পারলুম না।

তিনি কিন্তু ক্লান্তিহীন যোদ্ধার মত ক্রমাগত বলেই চলেছেন। সভাপতির ভাষণ ছেড়ে তিনি নানা অবান্তর কথার সৃষ্টি করলেন। কিছুক্ষণ আগেই তিনি আমার কানে কানে বলেছিলেন, তাঁর অত্যন্ত জরুরী কাজ আছে এবং এক্ষুণি তাঁকে চলে যেতে হবে। কিন্তু তাঁর বাক্যের স্রোত দেখে মনে হলো না—পৃথিবীতে তাঁর কোনও কিছুরই প্রয়োজন আছে। আমি ফিস্‌ফিস্ করে যত তাঁকে বসতে বলি তিনি কিছুতেই শোনেন না। এই ভাবে পঁচিশ মিনিট ধরে তিনি কথার ফুলঝুরি দিয়ে তাঁর সভাপতিকে ধন্যবাদ দেবার বক্তৃতা শেষ করলেন।

আমি তখন পালাবার পথ খুঁজছি। কিন্তু অনুষ্ঠানের কর্তারা আমায় ছাড়বেন কেন? তাঁরা সবাই এসে আমার চার পাশে অভিমন্যুর ব্যূহ রচনা করে বল্লেন, "এইবার President-এর Address দিন।" তখন সাতটা বেজে গেছে। আমি উঠে শুধু বল্লাম, "সভাপতির Address অমৃতবাজার পত্রিকা আপিস, বাগবাজার, কলকাতা।" এই বলেই নলিনীবাবুকে নিয়ে সটান

প্রস্থান। আর কোনও দিন সভাপতিত্ব করতে সে মুখো হইনি। অবশ্য তাঁরাও আর ডাকেন নি।

*　　*　　*

আমাদের খবরের কাগজের এলাহাবাদেও একটা আপিস আছে এবং সেখান থেকেও কাগজ প্রকাশিত হয়। সেইজন্য আমাকে মাঝে মাঝে সেখানেও থাকতে হয়, আর উত্তর প্রদেশের বহু অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়। একবার নিমন্ত্রণ এলো উত্তর প্রদেশের কোন শহরের হিন্দীভাষী মেয়েদের একটি বিদ্যালয় থেকে। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের মেয়ে। তারা বয়সে একটু বড়। কাজেই ভূতের গল্প কিম্বা বাঘের গল্প বল্লে চলবে না।

ওখানে পৌঁছুতেই প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মেয়েরা ধরে বসল, আমরা শুনেছি আপনি খুব হাসির বক্তৃতা করতে পারেন, আজ আমাদের কিন্তু হাসির গল্প শোনাতে হবে।

বল্লুম, "তথাস্তু"।

যেখানে শ্রোতারা বাংলা-ভাষা বুঝতে পারে না। আমি সেখানে সোজা ইংরেজিতে বক্তৃতা করি। তাতে রসিকতাটি জমে ভালো।

আমি আমার মনোভাব তাদের কাছে ব্যক্ত করতেই চারিদিক থেকে একটা আপত্তি হঠলো।

অনেকেই বল্লে "তা হবে না, আপনাকে আজ হিন্দী-ভাষায় বক্তৃতা দিতে হবে। আমরা আপনার কোন ওজর-আপত্তি শুনছি না।"

ভাবলুম বছর দশেক এলাহাবাদে রয়েছি। হিন্দীটা যে না বুঝি তা নয়। তবে কোনও দিন সেই ভাষায় বক্তৃতা দিইনি, এই যা। তবে পারবোই বা না কেন? যাই হোক মেয়েদের অনুরোধে প'ড়ে,—একটা হাসির বক্তৃতা সুরু করা গেল। অবশ্য হিন্দী ভাষায়।

আমার বক্তৃতার গল্প যত এগিয়ে যেতে লাগলো শ্রোত্রীদের হাসির মাত্রা ততই উদারা, মুদারা, তারা ছাড়িয়ে উর্ধ্বলোকে উঠতে লাগলো। কেউ কেউ তো তার পাশের সহধ্যায়িনীর গায়ে লুটিয়ে পড়লো। আমিও খুব উৎসাহ বোধ করলুম। ভাবলুম হাসির গল্পটা নিশ্চয়ই খুব জমেছে। নইলে মেয়েরা এতো আনন্দ ক'রে হাসছে কেন? আমিও দ্বিগুণ উৎসাহে আমার গল্প চালিয়ে যাই। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করি, "গল্প ক্যাসা হোতা হ্যায়?" সকলেই সমস্বরে

চীৎকার করে উঠে বলে "বহুৎ আচ্ছা।" আমার গর্বের আর পরিসীমা থাকে না। আমার গল্প যখন শেষ হোল, তাকিয়ে দেখি, মেয়েদের হাসির পালা কিন্তু শেষ হয়নি। কেউ কেউ এত হাসতে লাগলো যে সেই হাসির ঝর্ণা বন্ধ করবার জন্য নিজেরাই মুখে শাড়ির আঁচল বা রুমাল গুঁজে দিচ্ছিল। তাই বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়ে মেয়েদের ডেকে বল্লাম, "তোমরা সবাই আমার হাসির গল্প শুনে যে এতটা আনন্দ উপভোগ করবে তা আমি আগে ভাবতে পারিনি। যাই হোক আরও একদিন আমি তোমাদের হাসির গল্প শোনাব এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।"

এই সময়ে একটি বড় মেয়ে উঠে দাঁড়ালো। ক্লাসের সেরা মেয়ে কিনা কে জানে! সে আমায় সরাসরি জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা

আপনার কি ধারণা যে আমরা সবাই আপনার হাসির গল্প শুনে হেসেছি ?” আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, তার মানে ? নইলে এত হাসি এলো কোত্থেকে ? মেয়েটি তেমনি গম্ভীরভাবে বল্লে, “কিন্তু আমরা তো আপনার গল্প কিছুই শুনিনি।” এইবার আমার অবাক হবার পালা। জিজ্ঞাসা করল্লুম, “অ্যাঁ! বলছ কি তোমরা ? আমার গল্প তোমরা কেউ শোনোনি ? তবে হাসছিলে কেন ? ” মেয়েটি হেসে বল্লে, শুনবো না কেন ? তবে কিছুই বুঝতে পারিনি। আমরা হাসছিলুম আপনার চমৎকার হিন্দী শুনে। এটা হিন্দী, না বাংলা, না ইংরেজি ?” সঙ্গে সঙ্গে অন্য মেয়েরা হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলো। ব্যাপারটা হয়েছিল এই যে, যেখানে যেখানে হিন্দী-কথা, খুঁজে পাচ্ছিলাম না সেখানে বাংলা কিম্বা ইংরেজি কথা দিয়ে সেরে নিচ্ছিলাম। তা ছাড়া হিন্দীভাষায় গভীর জ্ঞান দেখাবার জন্য যে দু’চারটে শক্ত উর্দু কথা জানি (যেমন “তকল্লুফ, মেহ্‌মান, এতরাজ” ইত্যাদি) তা সুবিধে পেলেই কাজে লাগাচ্ছিলাম—তা মানে ঠিক হোক বা না হোক। এর পর থেকে নাকে খত আর কোনও দিন হিন্দী-ভাষীদের কাছে হিন্দীতে বক্তৃতা দিয়ে আমার হিন্দী-বিদ্যে জাহির করতে যাব না, যদিও বাঙালী ও মাদ্রাজীদের কাছে এখনও হিন্দীতে বক্তৃতা করতে ভয় পাই না—বিশেষ ক’রে বাঙালীদের কাছে। সেদিন আগ্রার এক সভায় একটি ছোট বক্তৃতা নিরুপায় হয়ে হিন্দীতে দিলুম। দেখি শ্রোতাদের মধ্যে জন কতক খুব হাততালি দিচ্ছে আর বাকী লোক সব বোবার মত বসে আছে। মিটিং-এর পর আমি, যাঁরা—আমার বক্তৃতা শুনে খুব আনন্দ ক’রছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ ক’রতে গেলুম। দেখলুম যে তাঁরা সবাই বাঙালী!

আমার মত যাঁরা শখের শিকারী, অর্থাৎ যাঁরা একটু সময় কাটাবার জন্যে শিকার করতে চান এবং শিকারের জন্যে কায়িক কষ্ট করতে পেছু হটে যান, তাঁদের আমি একটা বিষয়ে সাবধান ক'রে দিতে চাই। আশা করি তাঁরা কিছু মনে করবেন না। কোন পুকুরে কিম্বা জলাতে, যেখানে ঝাঁঝি, শ্যাওলা বা জলজ উদ্ভিদের জঙ্গল আছে, সেখানে কোন পাখী শিকার করলে যেন যাকে-তাকে ঐ পাখী উঠিয়ে আনতে বলবেন না। তাতে বিপদ হতে পারে। আমি সে সম্বন্ধেই এখানে আমার জীবনের দু'একটি সত্য ঘটনা বলব।
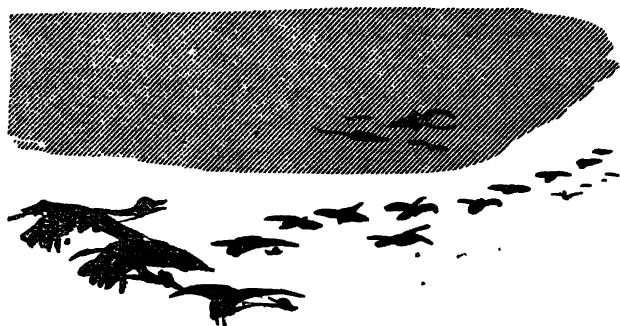
প্রথমেই ব'লে রাখি, আমি শিকারী নই। আমার শিকার হচ্ছে একটু সময় কাটানো, একটু আনন্দ করা, কিম্বা বনভোজনের একটা অঙ্গ। মোটরে যেতে যেতে হয়ত একটা পাখী, খরগোস কিম্বা হরিণ দেখলুম। সুবিধা হ'ল ত গাড়ির ভিতর থেকেই মারলুম, নয়তো নেমে কিছুদূর গিয়ে গুলি ছুঁড়লুম। আমার এই রকম শিকার বেশীরভাগই ইউ. পি-র এলাহাবাদ অঞ্চলে হয়ে থাকে। কখনও বা টুরে গেলে অন্যান্য জায়গায়, যেমন উড়িষ্যায়, এ রকম অনেক মজাদার শিকার করেছি।

কিছুদিন আগে আমরা একবার এলাহাবাদ থেকে বান্দার রাস্তায় যাচ্ছিলুম। এলাহাবাদ থেকে মাইল কুড়ি দূরে, প্রায় রাস্তার উপরেই, একটি মাঝারি পুকুর দেখতে পেলুম। তাতে গোটা কুড়িক teal হাঁস বসেছিল। পুকুরটির কোথাও কোথাও জঙ্গল বা সাদা জল। আমি পরপর ২।৩ বার গুলি করে সাতটা হাঁস মারলুম। এখন সমস্যা হ'ল সেগুলি আনা যায় কি করে। এর আগেই এই ব্যাপারে আমার যথেষ্ট তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেই জন্যে এখন আর আমি যাকে-তাকে গোঁয়াতুর্মী করতে দিই না।

আমাদের দলে ছিলেন শান্তিনিকেতনের গায়ক শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, আমার ভাগিনেয় মেজর নিতাই সরকার (এলাহাবাদ পত্রিকার ম্যানেজার) আর এক ভাগিনেয় শ্রীসুধীরকুমার দত্ত এবং আমার মামাত ভাই শ্রীভোলানাথ বিশ্বাস। ভোলানাথ আমার মত শখের শিকারী নয়। সে শিকার করতেও যেমন মজবুত, শিকারের জন্যে কষ্ট করতেও তেমনি পেছপাও নয়। সে জলে, জঙ্গলে, সব জায়গায় যেতে রাজী এবং এর পূর্বে নেকড়ে, হায়না ও প্রকাণ্ড কুমীর মেরেছে।

এবারে নভেম্বরেই এলাহাবাদে বেশ শীত পড়েছে এবং তখন বেলা প্রায় সন্ধ্যা। কিন্তু আমার ভাগিনেয় নিতাই বল্লে, "মামা আমি আর্মিতে ছিলুম, আমার ঠাণ্ডায় কিছু হবে না। আমি

গিয়ে হাঁস তুলে আনছি।" আমি বল্লুম, "যদি যাও ত গলা-জলের বেশী কখনো যেও না, তাতে হাঁস পাও-কি-নাই-পাও। ডুব-জলে সাঁতার কাটতে যেও না, কারণ জঙ্গলে জড়িয়ে গিয়ে ডুবে যেত পার।" সে 'আচ্ছা' বলে জলে নেমে গেল। নিতাই গলা-জল পর্যন্ত গিয়ে দেখলে যে হাঁস তখনও ৫।৬ হাত দূরে রয়েছে,

এবং সাঁতার না কেটে তার কাছে যাবার উপায় নেই। সে আমার কথায় আর অগ্রসর হ'ল না। এমন সময় ঘটল আর এক কাণ্ড।

এক বৃদ্ধ গ্রাম্যলোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইসব দেখছিলো। সে বল্লে, "হাম লায়েঙ্গে," বলে জলে নামতে গেলো। আমরা চেঁচিয়ে বল্লুম, "এই বুড্ঢা মাত যাও।" কিন্তু কে-কার কথা শোনে। সে এক লাফে জলে প'ড়ে এগিয়ে চল্লো। এগিয়ে যেতে যেতে বল্লে,
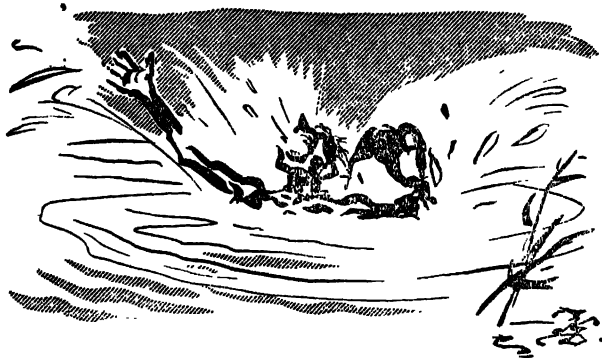
"আচ্ছা বকশিশ লেঙ্গে জরুর।" আমরা যত বারণ করি সে গ্রাহ্য করে না। আমার ভাগিনেয় তাকে আটকাতে গেল, কিন্তু লোকটি তাকে এড়িয়ে গিয়ে সাঁতার দিতে সুরু করলে। ৩।৪ হাত সাঁতার

দিয়েই সে ফিরে আসতে লাগল এবং চেঁচিয়ে বল্লে, "হাম ডুব যাতা হ্যায়—বাঁচাইয়ে, বাঁচাইয়ে!"

এইবার একবার চিন্তা করে দেখুন যে আমরা কি ভীষণ বিপদে পড়েছি। আমাদের চোখের সামনে একটা লোক ডুবে যাচ্ছে, কি করে তাকে বাঁচাব! নিতাই যদি গলা-জল থেকে ডুব-জলে যায়, তাহ'লে নিশ্চয় দুটোই ডুববে। কি করি! আমরা তাকে চেঁচিয়ে সাহস দিয়ে বল্লুম, "কুছ ডর নেই, আউর থোড়া চলা আও।" কিন্তু তার পায়ে তখন জলের তলার দাম জড়িয়ে গেছে, আর সে শীতেও হয়ে পড়েছে আড়ষ্ট। তার চোখে কি অসহায় দৃষ্টি, মুখে যেন মৃত্যুর ছায়া ভেসে উঠেছে। আমাদের কাছে একটা ছোট দড়ি ছিল। আমরা সেটা নিতাইকে ছুঁড়ে দিলুম। নিতাই বৃদ্ধের দিকে সেটার একটা ধার এগিয়ে দিয়ে বল্লে, "পাকড়ো।" কিন্তু সে দড়িটা ধরে এমন এক টান মারলে যে নিতাইও ডুব-জলে গিয়ে পড়ল। নিতাই লোকটার হাত ধরে পিছন-সাঁতার দিয়ে ডাঙ্গার দিকে আসতে চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু লোকটা তাকেও জাপটে ধরাতে সে জোর ক'রে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলে। এদিকে ভোলানাথও ততক্ষণে জলে নেমে পড়েছে, কিন্তু এত জঙ্গল ও জল এত ঠাণ্ডা যে তিনজনেই গলা-জল ও ডুব-জলের মধ্যে যুদ্ধ করছে। যতক্ষণ এটুকু লিখতে লাগল তার সিকি সময়ের মধ্যেই এই সব ঘটনা ঘটে গেল।

এই সময়ে হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে মোটরে একটা অতিরিক্ত টায়ার আছে। ড্রাইভারকে আদেশ দেওয়াতে সে নিমেষের মধ্যে টায়ারটা বার ক'রে ছুঁড়ে ওদের কাছে দিলে। তখন নিতাই ও সেই গ্রাম্য লোকটি ক্লান্তির শেষ সীমায় এসে পৌঁছেচে। মোটর

টায়ারটি পাবা মাত্র তারা তাতে ভর দিয়ে দম নিতে লাগল। পরে তাদের জল থেকে তোলা হ'ল। ডাঙ্গায় এসে দু'জনেই নেতিয়ে পড়ল। এইখানে বলে রাখি যে এরূপ ভীষণ বিপদে নিতাই যে কিরূপ মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করছিল তাহা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। ধৈর্যের পরীক্ষায় জিতেছিল বলেই সে গাঁয়ের লোকটির প্রাণ রক্ষা করতে পেরেছিল।

যদিও আমাদের কথা না শুনে নিজেকে ও আমাদের সবাইকে এমন বিপদে ফেলায় লোকটির উপরে আমি হাড়ে-হাড়ে চটে গিয়েছিলুম, কিন্তু তার কষ্ট দেখে আমাদের মনোবেদনারও সীমা ছিল না—বলা বাহুল্য তাকে আমি কিছু অর্থ সাহায্য করেছিলুম।

এই জাতীয় ঘটনা আগেও কয়েকবার ঘটেছে। একবার আমার ড্রাইভার মিশির নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বেঁচে গিয়েছিল। সেই ঘটনাটি বিখ্যাত লেখক পথচারী 'যুগান্তরে'র একটি পূজা-সংখ্যায় বর্ণনা করেছেন।* তিনি সেদিন সেই party-তে ছিলেন। সেদিন কোন সঙ্গী ঠিক সেই সময়ে নিকটে না থাকাতে আমাকেই ডিসেম্বরের ঠাণ্ডা জলে নামতে হয়েছিল।

মোটরে একটা শক্ত ও লম্বা দড়ি ও একটি বাতাস-ভরা টিউব রাখলে এই রকম বিপদে পড়তে হয় না। অনেক সময় বকশিশের লোভে গ্রামের লোকে জলে নামে, কিন্তু তারা হয়ত মোটেই সাঁতার জানে না, কিম্বা খুবই অল্প জানে। অথচ মুখে বলবে, "কুচ ডর নেই। হাম জরুর চিড়িয়া লায়েঙ্গে।" এদের কথায় যেন শিকারীরা না ভোলেন। তা'হলে এতে শুধু যে তাদেরই মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া হবে তাই নয়,—নিজেরাও বিপদকে ডেকে আনবেন।

*এই ঘটনাটি "শিকলপুকুরের শিকার কাহিনী" এই পুস্তকে দেওয়া হয়েছে।

পাখী যদি প্রাণবাঁচাবার জন্যে ব্যাধের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তা হ'লে খুব আশ্চর্য লাগে না কি? কিছু দিন আগে ঠিক এই রূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল সেই কথা আজ বলবো। ১৯৫৩ সালের খ্রীস্টমাসের সময় আমরা কিছু দিন বিন্ধ্যাচলে ছিলাম। বিন্ধ্যাচল খুব স্বাস্থ্যকর স্থান এবং এলাহাবাদ থেকে ৫০ মাইলের মধ্যে। এখানে পাহাড়ের ওপর একটি চমৎকার ডাক-বাংলো আছে। এখান থেকে অল্প দূরে অষ্টভুজার মন্দির। পাহাড়ের মাথা বলতে চূড়ো নয়, পাহাড়ের ওপরটা ৮।১০ মাইলব্যাপী সমতল ভূমি, যদিও জমি উঁচু-নিচু, পাহাড় অঞ্চলে যেমন হয়। এখানে চাষ-আবাদ হচ্ছে এবং ইঁদারা ছাড়া দু-তিনটি পুকুরও আছে। এই ডাক-বাংলোতে একবার মৌলানা আজাদ দিনকতক ছিলেন।

এখানে নানা রকম শিকার পাওয়া যায়, যেমন তিতির, বটের,

ময়ুর, এমন কি হরিণ পর্যন্ত। তা ছাড়া এখানে প্রায়ই চিতাবাঘের দর্শন লাভ হয়। ডাক-বাংলোর অনতিদূরে মা আনন্দময়ীর আশ্রম, সেখানকার স্বামীজী শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মচারী সেদিন আমায়

বলছিলেন যে, তার আগের দিনই সন্ধ্যার পরে তিনি একটি চিতা-বাঘকে আশ্রমের নিকটেই লুকিয়ে থাকতে দেখেছিলেন। সেটা একটা কুকুর ধরবার মতলবে বসে ছিল, খুব হৈ হৈ করাতে উঠে পালিয়ে যায়। এর দিন কয়েক পরেই আমাদের ওখান থেকে মাইল চারেক দূরে জঙ্গলের ধারে বাঘে একটা গরু মারে।

এই সব কারণে, অবশ্য প্রধানতঃ শিকারের জন্যেই, আমি যখনই বেড়াতে বেরুতুম আমার চাকর আমার বন্দুকটি ও কিছু কার্টিজ নিয়ে পিছু পিছু থাকত। অবশ্য আমি বাঘ মারার স্পর্ধা রাখি না। তবে হঠাৎ যদি তিনি কৃপা ক'রে দর্শন দেন তা হ'লে বন্দুকের আওয়াজ ক'রে তাঁকে সরিয়ে দিতে পারি এই ছিল আমার উদ্দেশ্য। এই অঞ্চলে বিষাক্ত সাপের সঙ্গে দু-একবার আমার দেখা হয়েছে। মাসখানেক আগেও উইণ্ডহ্যাম ও ট্যাণ্ডা ফল্‌সের রাস্তায় একটি মস্ত বড় ফণাধারী সাপের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এটা কি সাপ আমি বলতে পারি না, এর কালো রঙের মস্ত ফণা ও মাথায় খড়মের চিহ্ন ছিল। রাস্তার ধারেই একটু সামান্য জঙ্গলে সাপটি মাথা উঁচু করে রোদ পোহাচ্ছিল, আমার মামাত ভাই ভোলানাথ নিমেষের মধ্যে একে গুলি করে মারল। গ্রামের লোকেরা এর জন্য ভোলানাথকে বহু ধন্যবাদ দেন। কারণ এই সাপটি নাকি কয়েকবার তাঁদের তেড়ে আক্রমণ করতে এসেছিল।

এসব আত্মরক্ষার কারণ ছাড়াও আমার সঙ্গে বন্দুক রাখবার আসল উদ্দেশ্য ছিল শিকার। আর শিকার হচ্ছে পাখী, খরগোস —বড়জোর হ'ল হরিণ। এসব শিকার আমি এলাহাবাদ অঞ্চলেই করেছি মোটরে যেতে যেতে। কখনো বা গাড়ির ভেতর থেকেই মারলুম, কখনো বা নেমে। আমি যে রকমের শিকার করি তাতে তিতির শিকারই আমার কাছে সব চেয়ে লোভনীয়। প্রথমতঃ এর মাংস অতি সুস্বাদু, তাছাড়া এ মারা অত্যন্ত শক্ত। এদের সহজে দেখা যায় না, কাছে গেলে হঠাৎ উড়ে যায়, তখন সেই উড়ন্ত অবস্থায় মারতে হয়। আমি এই কারণে প্রায়ই শিকার

ফস্‌কিয়েছি, এছাড়া মাঠে তিতিরকে দেখতে পেলে তারাও আমাকে দেখতে পায় এবং দেখা মাত্রই দূরে চলে যেতে থাকে, কখনও বা আশেপাশে ছোট কাঁটা জঙ্গলে এমন লুকিয়ে পড়ে যে তাদের খুঁজে বার করা প্রায়ই অসম্ভব। আমি যা তিতির মেরেছি, তার বেশীর ভাগই মোটরে যেতে যেতে রাস্তার ধারে, হঠাৎ দেখতে পেয়ে মেরেছি। হেঁটে যা তিতির মেরেছি তা সামান্যই এবং তাও খানিকটা ভাগ্যবলে। যেমন এই রকম পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে নিকটেই কোন ক্ষেতে কিম্বা পাতলা ছোট জঙ্গলে, হঠাৎ নজরে কোনো তিতির পড়ে গেলে মেরেছি।

এইবার আসল ঘটনার কথা বলছি। সেদিন ঠিক হোল যে ডাক-বাংলো থেকে মাইল ছুই দূরে যে মতিয়া তালাও আছে সেখানে গিয়ে পিকনিক্ করা হবে। আমার বাড়ির লোকেরা রান্নার জিনিসপত্র নিয়ে সকাল সকাল রওনা হয়ে গেল। আমি বেলা ৯টার সময় আমার চাকর ও বন্দুক নিয়ে যাত্রা সুরু করলুম। রাস্তা সরু, কখনও বা মাঠ, কখনও বা ছোট জঙ্গল এবং কখনও বা ক্ষেতের ধার দিয়ে চলে গেছে। আমি হাঁটছি আর চতুর্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করছি শিকারের আশায়। চাকর বন্দুক ঘাড়ে ক'রে ঠিক আমার পেছনে পেছনে আসছে, যাতে আবশ্যক হ'লে, নিমেষের মধ্যে আমার হাতে বন্দুক তুলে দিতে পারে। তিতির শিকারে মোটেই সময় পাওয়া যায় না। সেইজন্য বন্দুকে আমি ছয় নম্বর গুলি ভরে রাখতুম।

এইভাবে যেতে যেতে হঠাৎ দেখি যে, একটা অড়হরের ক্ষেতের ধারে একটা তিতির চলছে। আমিও তাকে দেখলুম সেও আমাকে দেখলে এবং সঙ্গে সঙ্গে অড়হরের ক্ষেতে ঢুকে পড়লো। এই

অড়হর ক্ষেতটি বাবলা কাঁটার বেড়া দেওয়া, সুতরাং আমার সেখানে প্রবেশ নিষেধ। আমি বন্দুকটি হাতে নিয়ে বেড়ার ধারে গিয়ে ক্ষেতের ভেতর উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতে লাগলুম, কোমর সমান উঁচু এবং ফাঁক ফাঁক ছিল, কিন্তু পাখীটা চুপি চুপি দূরে চলে গিয়েছিল বলে আমি অনেক চেষ্টা করেও সেটার কোন খোঁজ পেলুম না। আমি নিরাশ হয়ে আবার মতিয়া তালাও-এর দিকে যাত্রা সুরু করেছি, এমন সময় ক্ষেতের ভেতর থেকে একটা চেঁচামেচি ও ঝটাপটির শব্দ কানে এলো। আমি চমকে ফিরে দেখি সেই অড়হর ক্ষেতের ভেতর হতে একটা বাজপাখী সেই তিতিরটাকে ছু'পায়ে ধরে নিয়ে মাটি থেকে উড়ে পড়ল। তিতিরটা চিৎকার করছে, ঝট্পট্ করছে। বোধ হয়, বাজপাখীটা তিতিরটাকে ভাল করে ধরতে পারেনি। আমি দেখলুম যে, তিতিরটা হঠাৎ বাজপাখীটার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলে। যদিও এতে তাকে অনেকগুলো গায়ের পালক বিসর্জন দিতে হলো। এইবার হলো, আশ্চর্য ঘটনা। আমি অবাক হয়ে দেখছি, আর সেই তিতিরটা পাগলের মতো তীরবেগে আমাদের দিকে উড়ে এল এবং আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ওপরে যে ঘটনার বর্ণনা দিলুম তা লিখতে যে সময় লেগেছে, এই ঘটনাগুলো ঘটতে তার শতাংশের এক অংশ সময়ও লাগেনি। তিতিরটা আমার বুক থেকে আমার পায়ের কাছে পড়ল আমি যেখানটায় দাঁড়িয়ে ছিলুম তার ছু'হাত দূরে একটি ছোট বাবলা গাছ ছিল, তিতিরটা গিয়ে তার নিচে আশ্রয় নিলে। সেটা আশ্রয় নেবার মত স্থান মোটেই নয় এবং সেখানে লুকোবার মত জঙ্গলও অতি অল্প। আমি দেখলুম যে, সেই ছোট গাছটির গুঁড়ির কাছে তিতিরটা বসে থর

থর করে কাঁপছে। আমি ইচ্ছে করলেই তাকে হাত বাড়িয়ে ধরতে পারি।

এইবার সুরু হলো দুই ব্যাধের যুদ্ধ। আমি বিভ্রান্ত অবস্থায় আছি এমন সময় দেখি যে, সেই নির্লজ্জ বাজপাখী তীরবেগে উড়ে এল এবং আমাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সেই পাখীটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। বাজপাখীটা রক্তের আস্বাদ পেয়েছে এবং হাতের শিকার পালিয়ে গেছে বলে রাগে কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়েছে। আমি যে একটা মানুষ টোটা ভরা বন্দুক হাতে করে দাঁড়িয়ে আছি, সে তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনলো না। আমি দিলুম
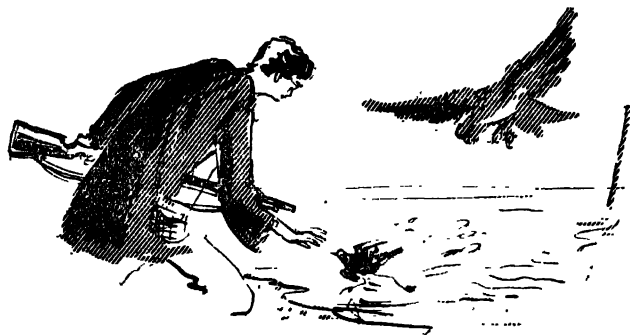
বাধা আর সে করল আক্রমণ। আমি চিৎকার করি আর বন্দুক নেড়ে বাজটাকে তাড়াবার চেষ্টা করি। বাজপাখীটা বারবার উড়ে যায় আর ফিরে আসে। আমি তখন ইচ্ছে করলেই তাকে গুলি করে মারতে পারতুম। কিন্তু আমার মনে হল, তার কী অপরাধ, আর তাকে মারবার আমারই বা কী অধিকার! সেও ব্যাধ, আমিও ব্যাধ, খাবার জন্য আমরা দু'জনেই ত এই তিতিরটাকে আক্রমণ করতে যাচ্ছিলুম!

দেখলুম বাজপাখীটা আমার চারপাশে গোল হয়ে উড়ছে আর

কেবলই আক্রমণের সন্ধান করছে। আর আমি যখন গুলি করবো না স্থির করলুম, তখন বাধ্য হয়ে আমাকে তিতিরটাকে তুলে নিতে হলো। এইবার বাজপাখী বুঝলো যে তার শিকারের আর কোন আশা নেই, সে দূরে উড়ে চলে গেল। আমি লক্ষ্য করে দেখলুম যে তিতিরটার আঘাত অতি সামান্য, মাত্র পিঠের দিকের কতকগুলি পালক খসে গেছে, আর সামান্য কিছু রক্তপাত হয়েছে। আমি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলুম এবং পাশের গ্রামে গিয়ে জল খেতে দিলুম। জল খাবার পর মনে হলো যে তিতিরটা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য, তখন তাকে আমার বাঁচাবার ইচ্ছেই প্রবল, খাবার ইচ্ছে সম্পূর্ণ চলে গেছে। কিন্তু ভাবলুম তখন যদি তাকে আমি ছেড়ে দিই, সেই দুশমন বাজপাখী কোথায় লুকিয়ে আছে জানি না, হয়ত তাকে আবার আক্রমণ করতে পারে। সেইজন্য তিতিরটাকে আমার কাছেই রাখলুম। সন্ধ্যের সময়ে সেই অড়হর ক্ষেতে গিয়ে তাকে ছেড়ে দিলুম। আমি ভাবলুম সারা রাত বিশ্রাম পেলে সে সকালবেলার পূর্বাবস্থা সম্পূর্ণ ফিরে পাবে এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার বলে আত্মরক্ষা করতে পারবে।

* * *

প্রায় এমনি একটা ঘটনা আর একবার ঘটেছিল। এলাহাবাদ থেকে ২৬ মাইল দূরে রেওয়ার রাস্তায় একটা বড় জলা আছে। সেখানে একদিন একটা Coot দেখতে পাই, আমাদের দেশে যাকে কোচোপাখী বলে। পাখীর রং কালো, পা হাঁসের মতো, ঠোঁটটা মুরগীর মতো, আর কপালে একটা তিলকের মত ফোঁটা। এই জলাতে কোথাও পরিষ্কার জল, আর বেশীর ভাগই জঙ্গল। আমি পাড়ে বসে এই পাখীটাকে গুলি করি। গুলিটা বোধ হয় ভাল লাগেনি, সেইজন্য এর ডানা ভেঙ্গে যায়, কিন্তু পাখীটা সম্পূর্ণ

জীবিত ছিল। সে জলে সাঁতার কাটতে কাটতে ক্রমেই আমার নিকট থেকে দূরে চলে যেতে লাগল। সে বন্দুকের সীমানার বাইরে যাওয়ায় আমার আর গুলি করা হলো না। এমন সময়

আমি অবাক হয়ে দেখলুম যে চিল জাতীয় একটা পাখী, যাকে মাছ-মৌরল বলে, Coot-টিকে আক্রমণ করেছে। কি করে যে মাছ-মৌরলটি বুঝতে পারল যে Coot-টির ওড়বার শক্তি নেই, তা আমার জ্ঞানের অগম্য। কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় তারা কখনোই এভাবে আক্রমণ করে না। মাছ-মৌরলটি ছোঁ মারবার চেষ্টা করছে আর Coot-টিও জলের ভেতরে ডুব মারছে আর খানিক দূরে গিয়ে ভেসে উঠছে। আমরা এই দেখে ডাঙ্গা থেকে

চেঁচামেচি করতে লাগলুম, কিন্তু মাছ-মৌরল সে-সব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না। আমরা বুঝলুম এই যুদ্ধে অতি শীঘ্রই ওই কোচোপাখীর প্রাণ যাবে; কিন্তু হোলো অন্যরকম। এইভাবে আত্মরক্ষা করতে করতে কোচোপাখীটা অনেকটা আমার দিকে চলে এল এবং আমি দেখলুম যে হাত ত্রিশেক দূরে সেটা ভেসে উঠেছে। সেখান থেকে আমি যেখানটায় ছিলুম তার সবটাই পরিষ্কার জল, কোন জঙ্গল নেই। কিন্তু পাখীটা খানিকটা ডুবে, খানিকটা সাঁতরে সোজা আমাদের দিকে চলে আসতে লাগল। মাছ-মৌরল তার কর্ম ছাড়েনি। তিনি সমানে ছোঁ দিচ্ছেন, আর কোচোও তেমনি ডুব দিচ্ছে। এই ঘটনা শেষ হলো আমার পায়ের কাছে, যখন কোচোটা আমার সামনে ডাঙ্গায় উঠে পড়ল। আমি তাকে ধরে ফেললুম, কিন্তু দুঃখের বিষয়, দু'ঘণ্টার ভেতরেই সে মরে গেল।

* * *

আর একটি ছোট শিকারের ঘটনার কথা এখানে ব'লছি। একবার রেওয়ার রাস্তায় এলাহাবাদ থেকে মাইল কুড়ি দূরে একটা

পুকুরে একটা চাহা মারতে যাই। সেই জায়গাটা উঁচু-নিচু ছিল, তাই সব জায়গাটা আমি দেখতে পাচ্ছিলুম না। আমি চাহাটাকে গুলি করলুম এবং সে নির্বিঘ্নে উড়ে গেল, কিন্তু সেইখান থেকে একটি পাখী চিঁ-চিঁ করে চিৎকার করতে লাগলো। আমি ভাবলুম,

এ কি হ'ল। সেখানে কি তবে দু'টো চাহা ছিল ? কাছে গিয়ে দেখি, একটি সুন্দর টিয়াপাখী ঘাসের উপর বসে রয়েছে। আমি

সেটা হাত দিয়ে ধরলুম। সেটার গায়ে ভীষণ জোর, আর বার বার আমাকে কামড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। যাই হোক, সেটাকে নিয়ে আমি বাড়ি চলে এলুম ও সেটাকে একটা খাঁচার মধ্যে রাখলুম। প্রথমে ভেবেছিলুম ওটা মরে যাবে, কিন্তু একদিন বাদেই সেটা বেশ সুস্থ হ'য়ে উঠলো ও খাবার খেতে আরম্ভ করলে। আমি সেটাকে খাঁচার বাইরে এনে ছেড়ে দিলেও সে উড়তে পারলে না, যদিও আমি অনেক খুঁজেও তার দেহে কোন আঘাতের চিহ্ন পেলাম না। খুব সম্ভবতঃ একটা ছর্‌রা তার ডানার কোন সন্ধিস্থলে বিদ্ধ হ'য়ে থাকবে। দিন কতকের মধ্যেই পাখীটা বেশ পোষ মেনে গেল এবং আমার স্ত্রী তাকে খাবার দিতেন বলে তাঁর খুব অনুগত হ'লো। আমার স্ত্রী তাকে যখন 'পুতু' বলে ডাকতেন, সে তখন খাঁচার ভেতর নাচতো। আমার স্ত্রীও তাকে যেমন ভালবাসতেন, সেও তেমনি তাঁকে দেখলেই আনন্দ প্রকাশ করতো।

এইভাবে ছ'মাস কেটে যাবার পর একদিন কী ক'রে খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে পাখীটা বেরিয়ে পড়ে। আমরা দেখে অবাক্ হলুম যে তার ডানা সম্পূর্ণ সেরে গেছে। প্রথমে সে উড়ে গিয়ে ছাদের কার্নিসে বসল। তারপরে সে এল ঘরের ভেতর এবং আমার স্ত্রীর মশারির চালে আশ্রয় নিলে। অতি অল্প আয়াসেই তাকে ধরা গেল এবং খাঁচার ভেতর বন্ধ করা হ'লো। এরপর আমার স্ত্রীকে ছু'দিন বিষণ্ণ দেখি এবং একদিন তিনি আমাকে বল্লেন, "তুমি পুতুকে যেখান থেকে ধরে এনেছিলে সেইখানেই গিয়ে ছেড়ে দিয়ে এসো।" আমি বল্লুম, "তুমি ওকে এত ভালবাস, ওকে ছেড়ে তুমি থাকবে কেমন করে?" তিনি বল্লেন, "তুমি ওর জোড়াটির কথা ভাব।" এই বলে তিনি চলে গেলেন।

পরদিন সকালে আমার স্ত্রী 'পুতু'-কে তার যতোরকম প্রিয় খাদ্য ছিল সব খাওয়ালেন। আমি তারপর তাকে নিয়ে মোটরে রেওয়ার রাস্তায় রওনা হলুম। যেখানে সে ধরা পড়েছিল, সেখানে গিয়ে দেখি, একটি টিয়াপাখীর ছোট ঝাঁক একটা বেলগাছের ওপর বসে রয়েছে। 'পুতু'-কে খাঁচার বাইরে আনলুম এবং শেষবার তার মাথায়-পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে ঘাসের ওপর ছেড়ে দিলুম। অভ্যাসমতো আমার সামনে সে বার ছুই নাচলে। সে যে সম্পূর্ণ স্বাধীন এ কথা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই সে উড়ে গিয়ে বেলগাছটির ওপরে সেই টিয়াপাখীর ঝাঁকের মধ্যে বসল। মনে হয়, এতদিন বাদেও সে তার প্রিয় কিম্বা প্রিয়ার সন্ধান পেয়েছে।

আমার (অ)শিকার কাহিনী

অনেকে তাঁদের শিকার কাহিনী লেখেন। আর আজ আমি লিখছি আমার কয়েকটি শিকারের বিফলতার কথা। আমার এই লেখা পড়লে শিকারীদের কি কি করা উচিত নয়, সে সম্বন্ধে তাঁরা কতকটা জ্ঞান লাভ করবেন আশা করি।

একবার এলাহাবাদ থেকে বান্দার রাস্তায় যাচ্ছি। পথটা বনের মধ্যে দিয়ে উঁচু-নিচু পাহাড়ী। হঠাৎ দেখলুম একটা ময়ূর রাস্তা পার হয়ে চলে গেল। তার চকিত চাহনি ও চনমনে ভাব দেখে বুঝলুম যে সেটা যেন কোন কারণে ভয় পেয়েছে। একটু পরেই দেখলুম একটা প্রকাণ্ড শেয়াল ময়ূরটা যেখান দিয়ে এসেছিল সেখান দিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়াল। এটার ভয়েই ময়ূরটা পালাচ্ছিল। আমার গাড়িও সেখানে দাঁড়িয়ে, আর শেয়ালটা মাত্র হাত পনের দূরে। আমরা বলাবলি করছি এতবড় শেয়াল ত কখনো দেখিনি। কেউ বলছেন—মারো, আবার কেউ বলছেন, শেয়াল মেরে কি হবে! এই ভাবে দু'তিন মিনিট কেটে গেল। জানোয়ারটা একটা টিলার পাশে ঝোপের আড়ালে মাথা উঁচু

করে দাঁড়িয়ে। আমরাও তাকে দেখছি, সেও আমাদের দেখছে। হঠাৎ সে হাই তোলার মত মুখটা করলে আর তার দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল। তার বড় বড় দাঁত দেখে আমরা চমকে গেলুম,— এ তো শেয়াল নয়, এ যে নেকড়ে! সেই সময় লক্ষ্ণৌ ও এলাহাবাদ জেলায় নেকড়েতে বহু ছোট ছোট শিশু ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, এ তো তাদেরই একটি। এই কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভীষণ উত্তেজনা হল এবং শিকারের নিয়ম-কানুন গেলুম ভুলে। মাণিকজোড় মারব বলে আমার বন্দুকে তখন B.B. Shot ভরা ছিল। আমার বোঝা উচিত ছিল যে, অত বড় জানোয়ার B.B.তে মরে না। হঠাৎ যদি হরিণ পাই, এই জন্য আমার কাছে L.G. Shot-ও ছিল। আমার উচিত ছিল তখুনি বন্দুকে L.G. ভরে নেওয়া। কিন্তু অত বড় নেকড়ে দেখে আমি তখন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছি আর নেকড়েটাও তখন আস্তে আস্তে চলে যেতে আরম্ভ করেছে। আমার আর ধৈর্য রইল না। বন্দুক তুলে দুম্ করে দিলুম B.B. Shot আওয়াজ করে। এর ফলে আমি যে সেদিন কি কষ্ট পেয়েছিলুম, তা আর বলবার নয়।

আমার গুলির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম যে নেকড়েটা মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু তখনি সে উঠে দাঁড়াল এবং পালাতে আরম্ভ করল। আমি দেখলুম যে তার সামনের একটা পা একেবারে ভেঙ্গে গেছে এবং সে নেংচে নেংচে তিন পায়ে চলছে। আমার গাড়িতে আমার দুই মামাতো ভাই—ভোলানাথ ও শিবু এবং আমার স্ত্রীও ছিলেন। ভোলা, শিবু ও আমি ভাবলুম—এ বেটাকে ত পেয়েছি। এ আর কতদূর যাবে, ধরা পড়ল বলে। আমরা বন্দুক নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়লুম ও তাকে অনুসরণ করতে প্রবৃত্ত হলুম। আমার স্ত্রী বল্লেন, "যেও না, এই পাহাড়- জঙ্গলে ওকে পাবে না—শুধু শুধু হয়রাণ হবে।" কিন্তু আমরা তাঁর কথা শুনলুম না, আর সেই হ'লো আমাদের কাল। নেকড়েটা ততক্ষণ প্রায় একশ' হাত দূরে চলে গেছে। আমরা তার ওপর নজর রেখে পিছনে পিছনে চললুম। নেকড়েটা মধ্যে মধ্যে দাঁড়ায় আর আমরা খানিকটা করে এগিয়ে যাই। কিন্তু বন্দুকের পাল্লার মধ্যে পাই না, যাতে আর এক গুলি মারতে পারি। বলা বাহুল্য, আমি এবার আমার বন্দুকে L.G. Shot ভরে নিয়েছি। নেকড়েটা একটু দাঁড়িয়েই ছুট দেয় আর আমরা অনেকটা পিছনে পড়ে যাই। এভাবে এঁকে-বেঁকে পাহাড়-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আমরা তিন-চার মাইল চলে গেলুম, কিন্তু কিছুতেই সেটার নাগাল পেলুম না।

*

এই উত্তেজনার মধ্যে আমরা লক্ষ্য করিনি যে কখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। সেই আবছা অন্ধকারে নেকড়েটা গেল হারিয়ে। আমরা স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে রইলুম, তারপর গাড়ির দিকে ফিরে চল্লুম। কিন্তু কোথায় গাড়ি, পথ কোন্ দিকে? কিছুই ত বুঝতে পারছি না। মনে পড়ল, এই জঙ্গলের মধ্যে গাড়িতে আমার স্ত্রী একা আছেন, সঙ্গে কেবল একটি বুড়ো ড্রাইভার। এও মনে পড়ল যে আমার স্ত্রী আসতে চান নি (তিনি কোনদিনই জীবহত্যা পছন্দ করেন না), আমি কেবল বনের মধ্যে চা খাব, এই লোভ দেখিয়ে তাঁকে সঙ্গে এনেছিলুম। কি করি, কোন্ দিকে যাই, বনের মধ্যে পথ হারিয়েছি। আমার তখনকার মনের অবস্থা বর্ণনা করবার নয়। পথে একটা নালা পড়ল। কই, যাবার সময় ত নালা দেখিনি! কাঁটা-জঙ্গল, উঁচু-নিচু জমি কিছুই আমরা মানছি না, পাগলের মত চলেছি।

বহুক্ষণ চলবার পর হঠাৎ অনেক দূরে একটা শব্দ শুনলুম। মোটরের হর্ণের শব্দ না! ঐ যে একটা আলো, না! হ্যাঁ, ঐ ত লছমন ড্রাইভার Spot-light ফেলছে। কি সর্বনাশ, আমরা যে উল্টো দিকে যাচ্ছিলুম। মোটরের ঠিকানা পেয়ে মনে যে কি আশা আর আনন্দ হল তা আমি বলতে পারব না। পাগলের মত আমরা সেই দিকে এগিয়ে চল্লুম—গাড়ি তখনো প্রায় এক মাইল দূরে। কিন্তু যখন হদিস পেয়েছি তখন আর ভয় কি?

সকল কষ্টেরই শেষ আছে। ক্রমে আমরা গাড়ির কাছে এলুম—মনে কি আনন্দ! আমার স্ত্রী ভয়ে আর দুর্ভাবনায় প্রায় আধমরা। আমাদের দেখে যেন প্রাণ পেলেন। লছমন বল্লে, "মাজী বহুতক্ষণ সে হর্ণ দেনে আউর আলো দেখানে বোলা। হাম

ত ঐ কিয়া হ্যায়, লেকিন আপ নেই দেখা।” আমরা দেখব কি করে? অত দূর থেকে হর্ণও শুনিনি, আর জঙ্গলের গাছের জন্য আলোও দেখতে পাইনি। সেদিন বনে কেমন চা খেয়েছিলুম সে কথা আর নাই বল্লুম।

বাড়ি ফিরে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলুম। পরে আমার স্ত্রী বলেছিলেন যে তাঁর নিজের চেয়ে আমাদের জন্য তাঁর বেশী ভাবনা হয়েছিল। তিনি ভেবেছিলেন যে নেকড়েটা নিশ্চয়ই বাসার দিকে যাবে, আর সেখানে আরও নেকড়ে থাকতে পারে ত। তারা যদি দল বেঁধে আমাদের আক্রমণ করে তা'হলে কি হবে? এ ভাবনাটা অবশ্য অগ্রাহ্য করবার নয়। যাই হোক, এ সব কিছুই হতো না— যদি আমি একটু ধৈর্য ধরে B.B.-র বদলে L.G. গুলি বন্দুকে ভরে নেকড়েটাকে মারতুম; তা'হলে সেখানেই তার পতন ও মৃত্যু হত। আমার সামান্য ভুলের জন্য সেদিন কি না হতে পারত?

আর একবার আমরা সুন্দরবনের পঞ্চমুখী খাল দিয়ে যাচ্ছি। আমার সঙ্গী অনেকে,—আমার পুত্র শ্রীমান তরুণকান্তি, ভাইপো শ্রীমান অনিলকান্তি, অসিতকান্তি ও শ্রীশচীবিলাস, মামাতো ভাই ভোলা ও তুলসী ও আরও দু'একজন বন্ধু-বান্ধব। সেদিন সকালে আমি একটা হরিণ মেরেছি, মনটা আনন্দে ভরপুর। তিনটে হরিণ ছিল। আমি রাইফেল দিয়ে এটাকে মারি। সেটা তখনি পড়ে

যায়—বেশ বিচিত্রিত হরিণ ছিল সেটি। মনে বেশ খানিকটা অহঙ্কার হয়েছে তার জন্য। এবার কি করে আমার দর্পচূর্ণ হল বলছি।
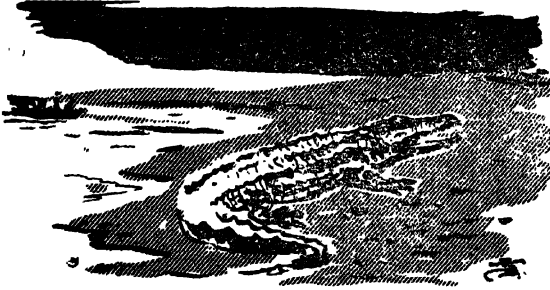
তখন বেলা তিনটে—খাল দিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ কেউ কেউ চেঁচিয়ে উঠল—পাড়ের ওপর ওটা কিরে? কুমীর না? কিন্তু অত বড় কি কুমীর হয়? আমাদের জলযান একটু পাড়ের দিকে নিয়ে যাওয়া হল। একি এ যে একটা প্রকাণ্ড কুমীর! চোদ্দ-পনেরো হাত লম্বা আর তেমনি মোটা। অত বড় কুমীর আমরা কখনো দেখিনি। সেটা মাথাটা ডাঙ্গার দিকে ও লেজটা জলের দিকে করে পড়ে আছে। আমার হাতে ছিল 355 Mauser রাইফেল। প্রায় ৫০।৬০ গজ দূর থেকে কুমীরটার ঘাড়ে গুলি করলুম। গুলি গিয়ে ঠিক ঘাড়েই লাগল আর কুমীরটা চমকে উঠল। তারপর দেখি কুমীরটার ঘাড় দিয়ে রক্ত পড়ছে আর সেটা নড়ে না। ব্যস হো গিয়া বলে আমি লাফিয়ে উঠলুম। ভোলা বল্লে, "আর একটা গুলি মারুন।" আমি বল্লুম, "কিচ্ছু দরকার নেই। দেখছ না বেটা নড়ছে-চড়ছে না। পালাবার হলে কি এখনও বসে থাকত?" ভোলা বল্লে, "আপনি জানেন না, কুমীর কখনো এক গুলিতে মরে না। এক যদি খুব বড় রাইফেল দিয়ে মারেন ত মরতে পারে। আপনি

আবার গুলি করুন।” আমি কিন্তু ভোলার কথা শুনলুম না। আমার ধারণা যে কুমীরটা মরে গিয়েছে; আর যদিও না মরে থাকে তা'হলে ও এমন ঘায়েল হয়েছে যে তার পালানো অসম্ভব।

কিন্তু ভোলার কথাই হল সত্য। কিছুক্ষণ পড়ে থাকবার পর কুমীরটা একটু একটু নড়তে লাগল। ক্রমে ক্রমে সে একটু একটু করে নদীর দিকে ফিরতে লাগল। দেখলুম যে সে তার বিরাট মাথাটা আর সামনের পা দুটোই মাত্র নাড়তে পারছে, তার নীচের শরীরটা সম্পূর্ণ অবশ। ক্রমে দেখি যে সে খুব আস্তে আস্তে জলের দিকে যাচ্ছে। তখনও আমার বিশ্বাস যে সে জল পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। কিন্তু শেষে অসম্ভব সম্ভব হল। হঠাৎ দেখি যে অসিত তার রাইফেল দিয়ে দমাদ্দম গুলি ছুঁড়ছে কিন্তু একটাও লাগছে না। এতক্ষণ আমি যেন কি রকম হয়ে গেছলুম। এইবার আমার জ্ঞান হল। কুমীরের মাথা ততক্ষণ প্রায় জলের কাছে পৌঁছে গেছে। আমি ভোলার হাত থেকে রাইফেল নিয়ে দু'তিনবার গুলি মারলুম, কিন্তু হায়, উত্তেজনার জন্য একটা গুলিও লাগল না। কুমীরটা জলে পড়ে গেল। আমার যে মনের অবস্থা তখন কি হয়েছিল আমি তা বর্ণনা করতে পারব না। এতবড় কুমীর আমার বোকামীর জন্য হারালুম! কি পরিতাপ! কেন ভোলার কথা শুনলুম না? কুমীরটা ত আমায় যথেষ্ট সময় দিয়েছিল। ইচ্ছে করলে আমি ত তাকে গুলি মেরে ঝাঁজরা করে দিতে পারতুম। মাঝিরাও বল্লে যে এত বড় কুমীর এর আগে তারা কখনও দেখেনি। এ বেটা কত মানুষ খেয়েছে, কে জানে!

আশা করি আমার এই কাহিনী পড়ে ভবিষ্যতে কোন শিকারী কোন কুমীরকে এক গুলি মেরে ছেড়ে দেবেন না।
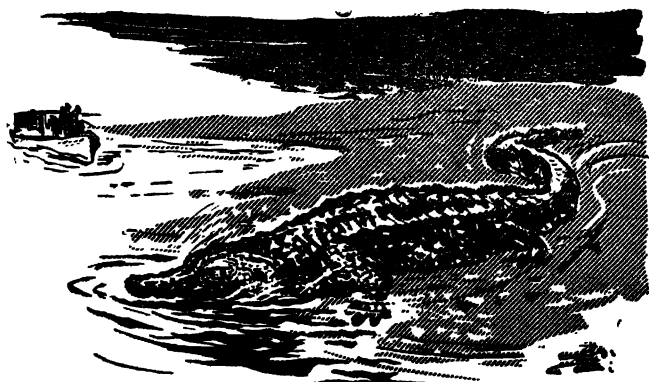
আমি এলাহাবাদ অঞ্চলে ও ভরতপুরে আগেও হরিণ মেরেছি, কিন্তু এই সুন্দরবনের হরিণটার আস্বাদ অতি চমৎকার ছিল। আমার সঙ্গীরা খুব আনন্দ করে খেয়েছিল, কিন্তু কুমীরের শোকে এমন সুস্বাদু খাদ্যও আমি ভোগ করতে পারিনি!

ঘটনাটা অনেক দিন আগের। কিন্তু এখনও তার সামান্য খুঁটিনাটি পর্যন্ত সুস্পষ্ট স্মরণে আছে।

বড়দিনের ছুটিতে এলাহাবাদে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন। যুদ্ধের হাঙ্গামায় যাতায়াতের অসুবিধা, খাদ্যাভাব, স্থানের অনটন ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং আক্রার দিনে দুর্গা-পুজোয় মোষের বদলে চালকুমড়ো বলির মতো শুধু নিয়মরক্ষার মতো সংক্ষিপ্ত আয়োজন। প্রচুর শীতবস্ত্রে প্রায় আপাদমস্তক আবৃত করে দিল্লী স্টেশনে সভাপতির সহযাত্রী হওয়া গেল। বাসনা—সম্মেলনশেষে কলকাতাও ঘুরে আসা।

এলাহাবাদ স্টেশনের প্ল্যাটফরমে পদার্পণমাত্রই শোনা গেল, বোমা! একটি নয়, দুটি নয়—পুরা একঝাঁক জাপানী বোমারু

বিমান আগের রাত্রিতে খাস কলকাতায় বোমা ফেলে গেছে। খবরের কাগজে অবশ্য প্রাণহানি বা বিশেষ ক্ষতির সংবাদ নেই। কিন্তু যুদ্ধের দিনে সংবাদপত্রকে পুরোপুরি বিশ্বাস করবে কে? তা ছাড়া প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎ মিলে ভূরি ভূরি। সুতরাং কলকাতা শহরটা যে জার্মান বোমা বিধ্বস্ত ওয়ারশ নগরীরই সমতুল্য হয়েছে একথা মনে না মানলেও মুখে অস্বীকার করার সাধ্য রইল না।

সন্ধ্যাবেলায় তুষারদার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে দেখি, ঘোরতর তর্ক। দাদা, বউদি, পুত্র রন্টু (শ্রীমান তরুণকান্তি) ও শ্যালক অজিত চারজনেই প্রায় এক সঙ্গে কথা বলায় চেষ্টিত, ফলে প্রায় কারো কথাই শোনার উপায় নেই। তর্কের বিষয়, কলকাতার ভবিষ্যৎ। বউদিদের মহিলা-সমিতির দ্বিপ্রাহরিক বে-সরকারী অধিবেশনে কোন এক মাননীয়া সদস্যা শ্রীযুক্তা মাতঙ্গিনী দেবী কি আর কেউ বলেছেন যে আর সাতদিনের মধ্যে জাপানীরা কলকাতা দখল করবে, লাটসাহেবের বাড়ির গম্বুজে সূর্যমার্কা নিশান উড়বে। তাই শুনে বউদি চিন্তিতা। কিন্তু তুষারদা বলছেন, তা কী করে সম্ভব? পূর্ববাংলা, চাটগাঁ, ঢাকা, কুষ্টিয়া, পোড়াদ' নেওয়ার আগে রেঙ্গুন থেকে এরোপ্লেন চেপে কলকাতা দখল হতে পারে কি? বউদি বলেন, পারে। দাদা বলেন, না। তর্কের মধ্যস্থলে রন্টু এবং অজিত দুই বিপরীত পক্ষে যোগ দিয়ে সংখ্যাবৃদ্ধি করল বটে, কিন্তু মীমাংসা হলো না। ক্রমে জাপান ছেড়ে মহিলামহলের সদস্যাদের গুজব-রটনার কথা উঠলো এবং অবশেষে তর্ক ব্যক্তিকে অতিক্রম করে জাতিতে সংক্রামিত হলো। তুষারদা ফ্র্যাঙ্ক এ্যাটাক্ করে বল্লেন—"মেয়েদের বিচারশক্তি নেই।" জবাবে বউদি একেবারে সোজা ইনভেশন চালালেন,—"পুরুষদের মাথায় আছে শুধু গোবর!"

এক সঙ্গে শ্যাম এবং কুল দুই-ই রাখার কসরৎ কিছুটা অভ্যাস ছিল। তাড়াতাড়ি মধ্যস্থ হয়ে বল্লেম, "কেউ কারো চেয়ে খাটো নয়, দুজনেরই ভাণ্ডার পূর্ণ, বস্তুটা আলাদা। মেয়েদের আছে ইনটুইশন, পুরুষের আছে ইণ্টেলেক্ট।"

দেখা গেল, ইংরেজকে নিরস্ত্র করা সহজ, জাপান দুর্ধর্ষ। বউদি ফস করে প্রশ্ন করলেন,—"ইনটুইশন আর ইণ্টেলেক্টে তফাৎ কী?" কঠিন প্রশ্ন!

মাথা চুলকে আস্তে আস্তে বল্লেম, "ইনটুইশন মানে—ইনটুইশন হচ্ছে by which the wife knows that she is always right and her husband is wrong আর ইণ্টেলেক্ট হচ্ছে তা যা দিয়ে the husband knows that the case is other way round but never says so."

কিন্তু তর্কের শেষ আছে, সংশয়ের নেই। বিশেষ করে সে যদি আত্মীয়, বন্ধু বা স্নেহভাজনদের নিরাপত্তা সম্পর্কিত হয়। সুতরাং কলকাতা যাওয়াটা উচিত হবে কিনা সে বিষয়ে আমি ছাড়া আর সবাই একমত হলেন। যাঁর গৃহে অতিথি হয়ে আছি, তিনি রেলের বড় অফিসার, বল্লেন, "স্টেশনে তোমাকে যাতে কেউ টিকিট না বেচে তার ব্যবস্থা করছি।" তুষারদা বল্লেন, "কলকাতার মতলব ছাড়ো। কাল চল মোটর নিয়ে শিকারে। শুনছি মাইল কুড়ি দূরে Snipe পাওয়া যায়।" আর বউদি বল্লেন, "কোথাও যাওয়া টাওয়া হবে না, রোজ রাত্তিরে এখানে এসে খাবে, কাল ছানার পায়েস করবো, পরশু ডাক-রোস্ট!"

এই সহৃদয়া মহিলার আদর যত্ন ও অপর্যাপ্ত স্নেহের ঋণ আমার পক্ষে অপরিশোধনীয়। তাঁর হুকুম অগ্রাহ্য করি এমন সাধ্য

ছিল না। পরদিন শিকারে যাওয়ার প্রোগ্রাম একেবারে পাকা করে গৃহে ফিরলেম।

বেলা বারোটায় মধ্যাহ্নভোজনের পর যাত্রা। পুরাকালে নৃপতিরা পাত্রমিত্র পরিবৃত হয়ে মৃগয়ায় যেতেন, সৈন্য-সামন্ত লোক-লস্করও বোধ হয় নেহাৎ কম থাকতো না। আমরা সংখ্যায় ছয়—তুষারদা, রন্টু, অজিত, নাতি ভোম্বল, আমি ও মিশির মোটর-চালক। আমি দর্শক। পাখী দূরে থাকুক, একটা আরশোলাও কখনও মারিনি। একদা পিতামহীর দিবানিদ্রার সুযোগে শিকেয় তোলা কুলের আচার অপহরণের সময় বোলতায় কামড়েছিল। স্কুলে রামদীন দরোয়ানের তোতাটাকে রাধাকৃষ্ণ নাম পড়াতে গিয়েও একবার চঞ্চুক্ষত হয়েছি। তারপর থেকে উড্ডীয়মান প্রাণীমাত্রকেই অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখি। তুষারদার হাতে বন্দুক, কার্ডবোর্ডের তিনবাক্স বোঝাই কার্তুজ, মাথায় রৌদ্রতাপ নিবারণের জন্য শোলার টুপি, পরনে ধুতি ও গায়ে টুইল-সার্ট, সোয়েটার ও কোট। সম্পাদককে এমন যোদ্ধৃবেশে দেখলে প্রেস এডভাইসর কার্চনার সাহেব অমৃতবাজারের উপর নিশ্চয়ই আরও কড়া নজর রাখতেন।

যমুনা অতিক্রম করে গ্রামের পথে যেতে হবে। ব্রিজের গায়ে প্রোটেক্টেড প্লেসের হলদে এনামেলের সাইন বোর্ড। দুই প্রান্তে বন্দুকধারী সান্ত্রী, অষ্টপ্রহর পাহারা। জাপানী গুপ্তচর বা পঞ্চম-বাহিনীর কেউ পাছে পুলটির কোন ক্ষতিসাধন করে, সেজন্য মোটর, টাঙ্গা, গরুর গাড়ি এমন কি পদাতিকদের পর্যন্ত খানাতল্লাস করা হয়। ড্রাইভার মিশির বল্লে, "তার গাড়ি প্রহরী-দের অত্যন্ত পরিচিত, বিনাতল্লাসেই ছেড়ে দেবে।" ভোম্বল

এলাহাবাদে এসে হিন্দী রপ্ত করার চেষ্টায় আছে, পারতপক্ষে বাংলা প্রায় বলেই না। মিশিরকে উপদেশ দিল—"গাড়ি আটকায় তো বোল দেও, গাড়িমে ভয়-ডরকা চীজ কুছ নেই। শুধু একটো বন্দুক আর একশো আশীঠো কার্তুজ।"

মাটির সড়ক। কিন্তু উত্তরভারতের খর রৌদ্রদগ্ধ পথ, বাংলা দেশের খোয়াবাঁধানো পথের চাইতে কোন অংশেই কম শক্ত নয়। মোটর চললো হু হু বেগে। মার্সিডিজ গাড়ি, হিটলারের জাত-ভায়ের হাতে তৈরী। স্পিডোমিটারের কাঁটা আশীর কোঠায় গেলেও আরোহীদের ঝাঁকুনী লাগে না।

দুই দিকে অড়হরের ক্ষেত। মাঝে মাঝে উঁচু জমিতে মাটি বাঁধানো বৃহৎ ইন্দারা। অনেকটা কাঠের ঘানির মতো চেহারার একটা দেশীয় যন্ত্রের দ্বারা এক জোড়া বৃষের সাহায্যে জল তোলা হচ্ছে, অগভীর নালার মধ্য দিয়ে সে জল নিকট এবং দূরবর্তী শস্যক্ষেত্রে সেচনকার্যে ব্যবহৃত। নির্মেঘ আকাশ—প্রখর সূর্য-কিরণে ঈষৎ পাণ্ডুর। পথ প্রায় জনহীন, কচিৎ দু-একটা মন্থরগতি গরুর গাড়ি বা শীর্ণকায় অশ্ববাহিত জরাজীর্ণ একার সন্ধান মিলে।

হঠাৎ সামনে দেখি সমস্তটা পথ জুড়ে মস্ত এক কাঠের গেট। সেখানে কয়েকজন পথচারী অপেক্ষমান। খাকী কোর্তা পরিহিত পুলিশের আকৃতি একটা লোক তাদের বোঁচকাবুঁচকি পরীক্ষারত। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, 'চুঙ্গী'। বিষ্ণুশর্মা বলেছেন, "অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রম্।" মিথ্যে নয়। 'চুঙ্গী' যে কী শব্দ এবং কি ভাষা তা আর যাই হোক্, অন্ততঃ আমাদের কারো কাছেই বোধগম্য নয়। কাছে এসে ব্যাপারটা বোঝা গেল। ঐখানে বৃটিশ-ভারতের সীমানা শেষ, রেওয়া রাজ্যের আরম্ভ। ঘি,

কেরোসিন, সোনা, রূপা ব্যক্তিগত প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় নিয়ে গেলে ট্যাক্স দিতে হয়। তাই বসানো হয়েছে এই সরকারী শুল্কবিভাগের ঘাঁটি।

কিন্তু শিকারের চিহ্ন কোথায়? হাওয়া খাওয়ার জন্যে তো বন্দুক নিয়ে মোটরে চাপার দরকার ছিল না। ঘাঁটির লোকেরা আশ্বাস দিয়ে বল্লো, "আর মাইল দশ-বারো এগোলেই পক্ষি-রাজ্যের দর্শন মিলবে।"

মাঝপথে একটি নদী। ঘনকৃষ্ণ-কুন্তলা নারীর সিঁথির মতো শীর্ণ একটি রেখা, কোনোখানে প্রায় বিশুষ্ক, কোথাও বা অগভীর জলের অতি ক্ষীণ প্রবাহ। তুই তীরের বিস্তীর্ণ বালুতট দেখে অনুমান করা কঠিন নয় যে বর্ষার দিনে বিপুল বেগবতী ধারা বহে এই স্রোতস্বতীতে, একূল-ওকূল ভাসিয়ে দিয়ে জল আসে মকাই ক্ষেতের কাছে কাছে। উত্তরভারতের সমস্ত নদ-নদীরই এই এক বিশেষত্ব। নদীর উপরে সুদৃশ্য একটি সেতু, মোটর হাঁকিয়ে পার হওয়া যায় অনায়াসে। নদীর নামটি মধুর—তমসা। সুপরিচিতও বটে, রামায়ণে এর উল্লেখ আছে। লোকাপবাদভীত রঘুপতি কর্তৃক পরিত্যক্তা সীতা আশ্রয় নিয়েছিলেন এরই তীরে মুনি বাল্মীকির আশ্রমে। যে ঋষি-কবি একটিমাত্র ক্রৌঞ্চমিথুনের বিরহবেদনায় বিচলিত হয়ে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা করেছিলেন, তাঁরই আশ্রমের আশেপাশে বন্দুকহস্তে পক্ষিনিধনে রত সম্পাদককে কল্পনা করা তাঁর পক্ষে নিশ্চয়ই সেদিন সম্ভব ছিল না।

গুড়ুম, গুড়ুম।

চিন্তাসূত্র ছিন্ন হলো, চেয়ে দেখি তমসা অতিক্রম করেছি অনেকক্ষণ। একটা উঁচু মাটির ঢিবির পাশে গাড়িতে বসে আছি

আমি আর অজিত, তুষারদা ঢিবিটার গায়ে উবু হয়ে শুয়ে বন্দুক তাক্ করেছেন, আর সবাই তাঁর পিছনে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ফলাফলের প্রত্যাশায়। আওয়াজ হতেই ছুটে গিয়ে দেখি দুটো পাখী লুটোচ্ছে ধূলায়, গুলি লেগেছে ঠিক তাদের পেটে। চেহারা

অপরিচিত, নাম শুনলেম—কারনুয়া। তারপর ক্রমাগত একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। কয়েকটা ক্ষেত; পার হয়ে খানিকটা দূর পায়ে হেঁটে এগুনো, এক ঝাঁক পাখী, মুহূর্তে বন্দুকের নিশানা ও ক্লিক্, বিকট শব্দ আর খানিকটা ধোঁয়া, কয়েকটা পক্ষিশাবকের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি। তুষারদা বৈষ্ণববংশের ছেলে, কাঁঠালের তরকারীতে গরম-মসলা দিয়ে গাছপাঁটা বলে যাঁর আমিষভোজনের শখ মেটানো উচিত, তাঁর যে এমন অব্যর্থ তাক্ তা কে জানতো? দাঁড়িয়ে, বসে, আধশোয়া অবস্থায় যে ভাবেই যখন বন্দুকের ঘোড়া টিপছেন তখনই জ্যৈষ্ঠ মাসের গাছ থেকে পাকা আমের মতো টুপ্ টাপ্ করে স্নাইপ, দুটো বুনো মুরগী বা তিনটে ডাক্ ভূপতিত হচ্ছে। যেন এ লাইনো টাইপে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ কম্পোজ হচ্ছে।

যত বলি, এবার হয়েছে, চলুন ফিরি—বলেন, রোস, আর একটা রাউণ্ড। পরশুরাম দেশকে নিঃক্ষত্রিয় করতে চেয়েছিলেন।

তুষারদা তাকে 'নিষ্পক্ষীয়' করবেন পণ করেছেন বুঝিবা। ক্লান্ত হয়ে সবাই এসে গাড়িতে বসলেম বিশ্রাম-মানসে। তুষারদা মিশিরকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চল্লেন সামনে। মাঠের মাঝখানে বিরাট এক দীঘি, তারই জলে বুনো হাঁসেরা সাঁতার কাটছে খবর পেয়েছেন।

পুকুর জিনিসটা বড় একটা চোখে পড়ে না বাংলার বাইরে। জল থাকে মাটির অনেক নিচে, ধরিত্রীবক্ষকে অনেকখানি বিদীর্ণ না করলে তার সন্ধান মেলে না, তাই রেওয়া রাজ্যের অখ্যাত পল্লীতে এই বৃহৎ জলাশয় দেখে বিস্মিত হলেম। খাড়া উঁচু পাড়, চারি দিকে প্রহরীর মতো একাধিক উচ্চ তাল বৃক্ষ, তার ছায়া পড়েছে রাত্রির

অন্ধকারের মতো ঘনকৃষ্ণ জলে। আকাশে সূর্য অস্তপ্রায়, চতুর্দিক নিস্তব্ধ জনমানবহীন, ডাইনে বাঁয়ে যে দিকে যতটা দৃষ্টি চলে একটানা মাঠ। কবে, কখন, কে বা কারা কার উপকারার্থে এই প্রান্তরের মধ্যে এমন বৃহৎ জলাশয় খনন করেছিলেন জানিনে। বর্তমানে একমাত্র পক্ষিসমাজের আড্ডা ছাড়া তার

আর কোন ব্যবহার আছে এমনও মনে হয় না। পাখী, পাখী, আর পাখী, পাখীর পিক্‌নিক্ পার্টি বল্লেও ক্ষতি নেই। লাল, নীল, সাদা, ধূসর যেমন বিচিত্র তাদের বর্ণ, তেমনি বিভিন্ন তাদের জাত। মূর্তিমান নিষাদরূপে সন্তর্পিত পদক্ষেপে অলক্ষিতে প্রবেশ করলেন তুষারদা, প্রথম গুলিতেই ঘায়েল হলো গোটা তিনেক ডাক্। একটা বড় সারস জাতীয় জীবের ডানায় লেগেছিল আঘাত, খানিকটা উড়ে গিয়ে দীঘির জলে মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল তার। জলে স্থলে ও নভোমণ্ডলে মুহূর্তে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হলো। পাখীর ঝাঁক ডানা মেলে ত্বরিত অন্তর্হিত হলো শূন্যপথে, বন্দুকহস্তে ঘাতক স্বয়ং কলরব তুললেন সাফল্যের আনন্দে এবং নিহত পক্ষী সংগ্রহের জন্য মিশির ঝাঁপিয়ে পড়ল দীঘির জলে।

মিশির সুলতানপুরের লোক, সাঁতার কাটতে জানে মাছের মতো। ভাসমান পক্ষীর মৃতদেহ বহন করে ফিরে আসছে তীরের দিকে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো—"ডুব রহা হ্যায়, ডুব রহা হ্যায়, বড়াসাহেব বাঁচাইয়ে।"

ব্যাপার কী? লোকটা তামাসা করছে না তো? না, ক্রমশঃ খাবি খাচ্ছে যেন। তুষারদা চেঁচিয়ে উঠলেন—"মিশির ডুবছে বাঁচাও, বাঁচাও, শীগ্‌গির এস।"

কিন্তু কে আসবে কোথা থেকে? কোথায় লোক, কোথায় জন? আমরা যেখানে গাড়িতে বসে সেখানে মজ্জমান ভৃত্য এবং উৎকণ্ঠিত প্রভু কারও আওয়াজই স্পষ্ট পৌঁছায় না। হঠাৎ দেখি, বন্দুক ফেলে ধুতি, জামা, জুতা, টুপিসহ জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তুষারদা। ভাল সাঁতার জানেন না, গলাজলে নেমে হাত বাড়িয়ে বলছেন,—"মিশির, এই যে, আর একটু, আর একটুখানি—" কিন্তু

মিশিরের তখন প্রায় শেষ অবস্থা, সাঁতার কাটা দূরে থাকুক, ভেসে থাকাই দায়, মাথাটা বার বার কেবলই তলিয়ে যাচ্ছে জলের তলায়।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে হাজির হলেম আমরা। কিংকর্তব্যবিমূঢ় সবাই ছুটাছুটি করছি এদিক-ওদিক, খুঁজছি একটা কাঠ কিংবা গাছের গুঁড়ি যা ছুঁড়ে দেওয়া যায় মিশিরের প্রাণরক্ষার্থে। ভোম্বল বিচলিত, কিন্তু হিন্দী ছাড়েনি চেঁচিয়ে বলছে,—"একঠো দড়ি, দড়ি লাও—দড়ি লাও।"

লাও তো বটে, কিন্তু আনে কে?

অবশেষে ভোম্বল জামা, গেঞ্জি খুলে ঝাঁপ দিল জলে, মিশির ততক্ষণে অনেকটা কাছে এসে পড়েছে। সাঁতার কেটে মিশিরকে টেনে তুলল অর্ধমৃত অবস্থায়। শুইয়ে দেওয়া হলো ঘাসের ওপরে। প্রায় আধঘণ্টা পরে মিশিরের বাক্‌শক্তি ফিরল। প্রশ্নের উত্তরে বলল, কী হয়েছিল সে নিজেই ঠিক জানে না, মনে হলো তার সর্বাঙ্গে খিল ধরেছে, কে যেন পা দুটো চেপে ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে জলের তলায়। আশ্চর্য?

শীতের সন্ধ্যা, উন্মুক্ত প্রান্তরে উত্তুরে হাওয়া গায়ে ছুঁচের মতো বিঁধে। তুষারদার আপাদমস্তক সিক্ত. জুতো-জামা-বসন থেকে জল ঝরছে। শীত সম্পর্কে আমি সর্বদাই অতিরিক্ত সাবধানী, বাড়ি থেকে বেরোবার কালে গাত্রবস্ত্রখানা সঙ্গে নিয়েছিলেম। স্মরণ করলেম, তুষারদা ঠাট্টা করেছিলেন, কাশ্মীরী শাল জড়িয়েছ কেন? শিকারে যাচ্ছি, তোমার শ্বশুরবাড়িতে নয়। আমার সেই পশমী শীতবস্ত্রখানা পরিধান করেই তাঁকে ঘরে ফিরতে হলো। নতুবা দিগম্বর মূর্তিতে, আমার দূরে থাক, নিজের শ্বশুরবাড়িতেও ফেরা কঠিন হতো।

কিন্তু ফিরবো কেমন করে? মিশিরের প্রাণ যদিবা বেঁচেছে, দেহে শক্তি নেই এতটুকুও, গাড়ি চালানো সম্ভব নয় তার পক্ষে।

রণ্টু বললে,—"বাবা, রাগ যদি না কর তো বলি, আমি গাড়ি চালাতে শিখেছি। সবাইকে নিয়ে যেতে পারবো এলাহাবাদে।"

শুনে বাবা তো ছেলেকে এই মারেন, কি সেই মারেন—"লক্ষ্মী-ছাড়া, তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে গাড়ি চালাচ্ছ, কোন্ দিন লোকচাপা দিয়ে যাবে জেলে। খবরদার, ফের শুনেছি গাড়িতে হাত দিয়েছ কি মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবো। কিছু বলিনে বলে—"

অস্বাভাবিক নয়। চপলমতি বালকের পক্ষে অভিভাবকের অজ্ঞাতসারে মোটর-চালনা নিশ্চয়ই অমার্জনীয় অপরাধ। কিন্তু শীতের রাত্রিতে এলাহাবাদ-থেকে চল্লিশ মাইল দূরবর্তী জনহীন প্রান্তরে দাঁড়িয়ে গৃহে প্রত্যাগমনের আর যখন দ্বিতীয় উপায় চোখে পড়ে না, তখন অত্যন্ত কঠোর বিচারকের পক্ষেও নিরপেক্ষতা রক্ষা করা কঠিন হয়। তুষারদাকে একান্তে বল্লুম,—"কাজটা অন্যায়ই করেছে, হাড় রণ্টুর গুঁড়িয়ে দিতে চান আপত্তি নেই,

দেওয়াই উচিত, কিন্তু সেটা বাড়ি পৌঁছে ধীরেসুস্থে দিলেই হবে, আপাততঃ বাড়ি ফিরতে হলে তাকেই গাড়ি চালাতে হয় যে।”

অবস্থাটা তিনিও তৎক্ষণে হৃদয়ঙ্গম করেছেন। বল্লেন,—“তোমরা যা ভালো বোঝ কর, আমি ষ্ট্রিক্ট ডিসিপ্লিন চাই, অন্যায় এপ্রুভ করতে পারবো না।” বুঝতে পারলেম, যথাসম্ভব গাম্ভীর্য রক্ষা করে বল্লুম, “সে তো ঠিক কথা, আপনি শুধু গাড়িতে চেপে চুপচাপ বসে থাকুন, আর যা কিছু করার আমরা করছি।” তিনি তাই করলেন। এপ্রুভ করলেন না, গাড়িতে বসে রইলেন। কিন্তু চুপচাপ নয়। গাড়ির গতি বিশ মাইলের উপরে উঠলেই চেঁচিয়ে ওঠেন, “ও কী হচ্ছে, অ্যাক্সিডেন্ট করতে চাও?” অবশেষে বিরক্ত হয়ে রন্টু একবার বল্লে—“বাবা, বুঝছ না ভারি গাড়ি আস্তে চালালে কাঁপতে সুরু করে।”

“—কিন্তু জোরে চালালে যে আমি কাঁপতে সুরু করি।”

একবার গাড়ি ও একবার গাড়ির মালিক এই দুই-এর মধ্যে ভাগাভাগি হারে কাঁপুনি চলতে-চলতেই রাত সাড়ে নটায় এলাহাবাদে পৌঁছুলেম। তুষারদার বাড়িতে উৎকণ্ঠার শেষ নেই। প্রায় থানায় ও হাসপাতালে ফোন করা বাকী। বৈঠকখানায় পাড়ার বৃদ্ধ রঘুনন্দনপ্রসাদ তেওয়ারী ছিলেন, সমস্ত শুনে পরম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বল্লেন,—“তুষারবাবুজী, আপনাদের পিতামহের পুণ্যি, প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছেন। আপনি বারাহমন্—”

বাধা দিয়ে বল্লেম,—“না কায়েত—”

তিনি কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে বল্লেন—“আপনি সঙ্গে ছিলেন, তাই, নইলে ঐ পুকুরে নেমে আজ পর্যন্ত কোন লোক জ্যান্ত ফেরেনি।”

ভদ্রলোক গল্প বলার আর্টটা জানেন। বল্লেন,—"ঐ অভিশপ্ত পুকুরের নাম 'জিঞ্জিরী তালাও'—শিকলপুকুর। জলের নিচে এক বৃহৎ ভৌতিক লৌহ শৃঙ্খল আছে যা পায়ে জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে পাতালে টেনে নেয়। মানুষ, গরু, বাছুর, ছাগল, মোষ, কত যে ঐ রাক্ষুসে শিকলের মৃত্যু-আলিঙ্গনে নিশ্চিহ্ন হয়েছে তার আর সীমাসংখ্যা নেই। শুনুন তবে ওর ইতিহাস।" উৎসুক শ্রোতার দল ফরাসের উপর খাড়া হয়ে বসলো। মনে মনে ভাবলেম, রবিঠাকুরের 'ক্ষুধিত পাষাণে'র হিন্দী অনুবাদ পড়েছেন কি? ভদ্রলোক নাসারন্ধ্রে এক টিপ নস্য গ্রহণ করে সুরু করলেন—

অনেক অনেক বছর আগে—

এমন সময় অন্দরমহল থেকে ষ্টেথেস্কোপ হস্তে ডাক্তার ভাদুড়ী বেরিয়ে এসে বল্লেন,—"মিশিরকে দেখলেম, কোনো ভাবনা নেই, একদিন রেষ্ট নেবে, আর এই মিকশ্চারটা আনিয়ে নেবেন দোকান থেকে। সাঁতার কাটতে গিয়ে হঠাৎ পায়ে স্প্যাজম ধরেছিল, তাতে মাস্‌লস কনট্রাক্‌সন হয়েছে।"

শিকলপুকুরের গল্পটা সবেমাত্র জমে আসছিল।

রঘুনন্দনপ্রসাদ বিরক্তির সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপ্ ডাগ্‌দর্ হ্যায়, ইংরেজী পড়েছেন, দেবদ্বিজে আস্থা নেই। আচ্ছা নিজে কখনও দেখেছেন সেই জিঞ্জিরী তালাও?"

—না।

—সে পুকুরের জলে নেমেছেন?

—কোনদিন না।

—মিশির যখন ডুবছিল, আপনি সঙ্গে ছিলেন?

—না, তাও নয়।

—তব্? তবে?

হাতাহাতি হতে পারেনি, আমরা মাঝে পড়ে থামিয়ে দিয়েছিলেম। কিন্তু সেই থেকে ডাক্তার আর রঘুনন্দনপ্রসাদের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ। মুখ দেখাদেখি নেই।

সাপের মুখে

যাঁরা বড় শিকার করেন, অর্থাৎ বাঘ ভালুক মারেন, তাঁদের অনেক সময়ই বিপদে পড়তে হয়। কখনো হাত-পা, কখনও বা প্রাণও হারাতে হয়। এরূপ বহু ঘটনা আমার জানা আছে। কিন্তু আমার মত নিরীহ শিকারী—যাঁরা পাখী, খরগোস বড়জোর হরিণ শিকার করেন, তাঁদেরও মধ্যে মধ্যে ঘোর বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। আমাদের অমৃতবাজার গ্রামে একবার আমি সাপের হাতে মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলুম।

আমাদের গ্রামের উত্তর দিকে মহাদেব চক্রবর্তীর ভিটে ও পুকুর। পুকুরের চারিপাশ গভীর জঙ্গলে আবৃত। একদিন সকালে দূর থেকে দেখলুম যে, সেই পুকুরে একটা ডাক (ডাহুক) পাখী জলের ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার মনে হ'ল যে, সেটাকে মারতে গেলে কাছে যাওয়া দরকার, আর লুকিয়ে কাছে যেতে হ'লে বনের ভিতরেই ঢুকতে হবে। আমাদের গ্রামে বহু বুনো শুয়োর ও নানা জাতের সাপ অহরহঃ দেখা যায়। আমরা সেইজন্যে সহজে বনের মধ্যে ঢুকি না। কিন্তু সেদিন কি জানি কেন ভাবলুম যে, সকাল বেলা এত ভয়ের কি আছে? একটু চোখ মেলে থাকলেই শুয়োর সাপের হাত এড়াতে পারব। এই ভেবে আমি বন্দুকে কার্তুজ ভ'রে পুকুরের একধারে জঙ্গলে প্রবেশ করলুম।

মাটির দিকে নজর রেখে গুঁড়ি মেরে চলছি যাতে কোন বিপদে না পড়ি, আর পাখীটাও যেন আমাকে দেখতে না পায়। এই রকম ক'রে একটা পাতলা জঙ্গলের মধ্যে যেখানে গিয়ে পৌঁছলুম, সেখান থেকে ডাকটাকে বেশ রেঞ্জের মধ্যে পাওয়া যায়। সেখানে ব'সে পড়ে আস্তে আস্তে মাথা উঁচু ক'রে দেখতে লাগলুম যে পাখীটা কোন্‌খানে আছে। এই ভাবে মাথা উঁচু ক'রে দেখতে গিয়ে হঠাৎ আমার উপর দিকে চোখ পড়ল, আর যা নজরে এল তাতে ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে গেলুম।

আমি একটা সাঁড়া গাছের নিচে বসেছিলুম। সেই গাছটার গায়ে অনেকগুলো স্বর্ণলতা জড়িয়ে ছিল। আমি দেখলুম যে, অনেকগুলো সবুজ রঙের কি সজনে খাড়ার মত ঝুলে আছে। সেগুলো আবার একটু একটু দুলছে। অন্ধকারে ভালো লক্ষ্য করে দেখি যে, সেগুলো লাউডগা সাপ,—প্রায় দশ পনেরটা

এখানে-সেখানে ঝুলে রয়েছে। এতক্ষণে তারাও আমাকে দেখতে পেয়েছে এবং ঈষৎ চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। একটা সাপ দেখলুম যে ডাল দিয়ে আমার দিকে নেমে আসছে।

আমি জানতুম, লাউডগা সাপের খুব বিষ, কামড়ালে আর রক্ষে নেই। অথচ পালাই কি করে? সাপগুলো আমার চার-পাশে, মাথার প্রায় একহাত উপরে ঝুলছে। মাথার উপর লাফিয়ে পড়লেই সর্বনাশ। তখন আর ভাববার সময় ছিল না। যা থাকে কপালে বলে একলাফে সেখান থেকে সরে এলুম এবং কাঁটা-জঙ্গল ভেঙ্গে উর্ধ্বশ্বাসে বাইরে এসে পড়লুম। সেদিনকার কথা ভাবতে গেলে এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

আর একবার আমাদের গ্রামে 'হিজল গাড়ি' নামে একটা জলার ধারে একটা ডোমকুর (WaterFowl) মেরেছিলুম। জলার সেই পাড়টায় কশাড় বন। আমি পাখীটাকে আনবার জন্যে খুব কাছে গেছি, এমন সময় দেখলুম যে, কি একটা পাখীটাকে উঠিয়ে নিলে। সেখানটা অন্ধকার মত; একটু ভাল করে চেয়ে দেখি যে, একটা প্রকাণ্ড বোড়া সাপ জলের ধারে হেলানো একটা

খেজুর গাছে তার লেজটা জড়িয়ে আছে। সেইটাই ডোমকুরটাকে মুখে ক'রে নিয়েছে। আমি না জেনে সাপটার প্রায় ৫।৭ হাত দূরে মাত্র গিয়ে প'ড়ে কি ভয় যে পেয়েছিলুম আর কি করে যে পালিয়ে এসেছিলুম তা বলতে পারব না।

আর একবার আমার বুদ্ধির দোষে আমার এক মামাত ভাই বৈদ্যনাথ ভীষণ বিপদে পড়েছিল। অমৃতবাজার গ্রামে আমাদের একটা খুব বড় পুকুর আছে, তাকে ঘোষেদের দীঘি বলে। আমার ঠাকুরমা অমৃতময়ীর আমলে এই দীঘি একটা দেখবার মত পুষ্করিণী ছিল। প্রকাণ্ড পুকুর, পরিষ্কার জল টলটল করছে, চমৎকার বাঁধান ঘাট। আমার ঠাকুরমা নিজে এই ঘাট থেকে জল তুলতেন; এখন আমাদের আমলে এই পুকুরের আর সে শ্রী নেই। চারদিক জঙ্গলে ভ'রে গেছে। জলে শেওলা, পানিফল ইত্যাদি জলজ উদ্ভিদ্। সাঁতার কাটা যায় না, এমনি তার অবস্থা।

তখনও পাকিস্থান হয়নি। সে সময় প্রায়ই শিকার ও পিক-নিকের জন্য দেশে যেতুম। ঘটনাটা ঘটেছিল পূজোর ঠিক পরেই। তখন অল্প শীত পড়েছে, একদিন আমি ও বৈদ্যনাথ কলকাতায় আসব, আমাদের পুকুরের পাশ দিয়েই রাস্তা, আমরা সেই পথ ধরে কপোতাক্ষী নদীর দিকে চলেছি। সেখান থেকে নৌকো ক'রে ঝিকারগাছা ঘাট স্টেশনে গিয়ে কলকাতার ট্রেন ধরবো। হঠাৎ দেখি যে, ঘোষেদের দীঘিতে তিনটে সরাল হাঁস পড়েছে। তারা জলের ঠিক মধ্যিখানে সাঁতার কাটছে আর গুগ্‌লি লতাপাতা খেয়ে বেড়াচ্ছে। আমার সঙ্গে বন্দুক ছিল। আমি তৎক্ষণাৎ এক সঙ্গে তিনটেকেই মারবার জন্যে অনেক চেষ্টা করলুম, কিন্তু কিছুতেই তাদের এক লাইনে পেলুম না। তখন অগত্যা গুলি

ছুঁড়ে দুটোকে মারলুম, অপরটা উড়ে গেল। এখন সমস্যা হলো, হাঁস আনা যায় কি ক'রে।

বৈদ্যনাথ বল্লে, "এ জলে সাঁতার দেওয়া যাবে না, দামে পা জড়িয়ে ডুবে যাওয়াই সম্ভব।" আমি তাকে বল্লুম,—"তোমার মত পাকা সাঁতারু ডুবে যাবে! আর এ কতটুকুই বা দূর! তুমি একটু কষ্ট করলেই পারবে। আর কেউ হয়ত পারত না, কিন্তু তোমার কাছে এসব ব্যাপার ত অতি তুচ্ছ। এই হাঁস আমরা কলকাতায় নিয়ে যাব।" বৈদ্যনাথের এক দুর্বলতা আছে। তাকে চুমরে দিলে সে সব কাজই করতে রাজী। একে ত সে বলবান ও ডানপিটে, তার উপর আমি বলেছি যে, এ-কাজ সে ছাড়া আর কেউ পারবে না। ব্যস, আর কি! সে এক লাফে জলে নেবে পড়ল।

হাঁস দুটো ডাঙ্গা থেকে প্রায় ত্রিশ হাত দূরে পড়েছিল। বৈদ্যনাথ সোজা তাদের দিকে সাঁতরিয়ে চল্‌ল। কিন্তু গন্তব্যস্থানে যাওয়াটা মোটেই সহজ ছিল না। হাত দশ-বারো গিয়েই জলা-জঙ্গলের সঙ্গে তার যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। সে দু-হাতে শেওলা ঝাঁজি ছেঁড়ে, আর একটু এগোয়। মানুষ কতক্ষণ এ ভাবে সাঁতার কাটতে পারে? সে শীঘ্রই হাঁপিয়ে পড়ল। তখনও যদি সে ফিরে

আসে তো বিপদ হয় না। কিন্তু আগেই বলেছি, সে সহজে হার মানবার ছেলে নয়। ফলে এই হল যে, তার দম সম্পূর্ণ ফুরিয়ে গেল। জঙ্গলে পা জড়িয়ে এক একবার ডুবে যায়, আবার হাতড়ে-মাতড়ে ভেসে ওঠে। আমি চীৎকার করে বলি, "ফিরে এস।" কিন্তু আসে কে! তার তখন সত্যই খাবি-খাবার অবস্থা, কিন্তু প্রাণের মায়া বড় মায়া! সে অনেক কষ্টে পুকুরের ধারের দিকে খানিকটা এগিয়ে এল। সেই পাড়ে একটা প্রকাণ্ড যজ্ঞিডুমুরের গাছ ছিল। সেটা হেলে জলের উপর অনেকটা দূরে গিয়ে পড়েছে। তার ডালপালাগুলো জলের প্রায় দু'হাত উপরে। বৈদ্যনাথ অনেক কষ্টে সেই গাছের ডাল ধরলে, দম নেবার জন্যে। আমি ভাবলুম, যাক্ বৈদ্যনাথ এইবার বেঁচে গেল।

কিন্তু হঠাৎ বৈদ্যনাথ "বাপরে" বলে চীৎকার ক'রে ডালটা ছেড়ে দিল। আমি চেয়ে দেখি যে, সেই ডাল জড়িয়ে ধূসরবর্ণ এক প্রকাণ্ড গোখ্‌রো সাপ, যাকে হিন্দীতে বলে আধসর, সেই ডাল জড়িয়ে রোদ পোয়াচ্ছে। বৈদ্যনাথ ডাল ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডুবে গিয়েছিল এবং ভেসে উঠেই আবার ডালটা ধরলে। তার তখন কিছুমাত্র দম ছিল না। ডাল ছেড়ে দিলে ডুবে যায় ডাল ধরলে সাপে খায়! সেইজন্য সে এক একবার ডাল ধরে একটু দম নেয়, আর যেই সাপটা মাথা তোলে, ডাল ছেড়ে দেয়। বোধ হয় শীতের জন্য সাপটা একটু অলস ছিল। যাই হোক বৈদ্যনাথ ও আমি দুজনেই বুঝতে পারলুম যে, এ খেলা বেশীক্ষণ চলবে না। আমি ভাবছি সাপটাকে গুলি করি, কিন্তু যদি বৈদ্যনাথের গায়ে লাগে। কিন্তু তখন ভাববারও বেশী সময় ছিল না, কারণ ভয়ে ও ক্লান্তিতে বৈদ্যনাথের তখন প্রায় শেষ অবস্থা।

এতক্ষণ পর্যন্ত বৈদ্যনাথ যখনই ডালটা ধরছিল, সাপটা মাথাটা করছিল। কামড়াবার কোন লক্ষণ দেখিনি। আমি বন্দুকে

B.B. Shot ভ'রে উদ্বিগ্ন হয়ে লক্ষ্য করছি, এমন সময় দেখি সাপটা প্রকাণ্ড ফণা তুলে প্রস্তুত হয়েছে। খেলে বৈদ্যনাথকে আর রক্ষে নেই! জানিনা আমার অবস্থায় আর কেউ পড়েছেন কিনা। আমিই জোর ক'রে তাকে জলে নাবিয়েছি—আমিই তার মৃত্যুর কারণ। অনুতাপে ও দুশ্চিন্তায় দগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। পারব না বৈদ্যনাথকে বাঁচাতে? নিশ্চয় পারব।

আমার বন্দুক গর্জন ক'রে উঠল। গুলি গিয়ে লাগল ঠিক সাপের ফণাতে। নিমেষের মধ্যে সাপটা লেজের বাঁধন খুলে জলের মধ্যে পড়ে গেল। বৈদ্যনাথ যেখানে ডাল ধরে ধুঁকছে, সাপটার দেহ তার পাশেই পড়ল ও খানিকটা নড়ে-চড়ে স্থির হয়ে গেল। রাখে কৃষ্ণ মারে কে? একি বৈদ্যনাথের পুনর্জন্ম নয়?

বৈদ্যনাথকে জল থেকে তুলে চা-টা খাইয়ে চাঙ্গা করা হ'ল, তারপর সাপটাকে আমরা পুড়িয়ে ফেললুম—কি জানি বাবা, যদি আবার বেঁচে ওঠে! অবশ্য সেদিন আর আমাদের কলকাতায় ফেরা হয়নি। সরাল দুটোর কি হ'ল, তা আমি ভুলেই গেছি।

খবরের কাগজে একটা অতি দুঃখের সংবাদ পড়লুম। বৃশ্চিক দংশনে একটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল এবং সেখানে তাকে কতকগুলো ইন্‌জেক্‌সনও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শিশুটির জীবন রক্ষা হয় নি। খুবই দুঃখের কথা এই যে, আমাদের হাসপাতালে কাঁকড়া বিছের কামড়ের প্রতিষেধক কোন ওষুধ নেই। অবশ্য এও হতে পারে যে, বৃশ্চিকের বিষ এতই উগ্র যে, শিশুদেহে তা প্রায় সাপের বিষের মতই ত্বরিত কার্যকরী। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান হওয়া উচিত।

কিছুদিন আগে খবরের কাগজে কাঁকড়া বিছের ওষুধ সম্বন্ধে কতকগুলো চিঠি প্রকাশ করা হয়েছিল। নানা লোকে নানা রকম ওষুধের কথা লিখেছিলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে সবচেয়ে কোন্‌টা উপকারী ও কার্যকরী তা আমি বলতে পারি না। অথচ কাঁকড়া বিছে প্রায় সব জায়গায়ই দেখা যায় এবং ভয়ের কথা এই যে এরা অনেক সময় ঘরের মধ্যেই থাকে। টালীর নিচে, অন্ধকারে দেয়ালের ফাটলের মধ্যে, পুরোনো জানলার কাঠের মধ্যে, এমনকি পুরোনো খাতা-পত্র যেখানে থাকে সেখানেও এদের দেখতে পাওয়া যায়। শুধু যে এদের গরমের সময় দেখতে পাওয়া যায় তা নয়, শীতকালেও এদের দর্শন মেলে। তখন হয়ত এরা কিছুটা দুর্বল ও মন্থর থাকে। গরমের সময় আমি এদের নৈনিতালে প্রায় দেখতাম, বাথরুমে কাপড়-জামার মধ্যে লুকিয়ে থাকত। আমরা সেই জন্য খুব সাবধান হয়েছিলুম এবং ভাল করে না দেখে জামা-কাপড় ব্যবহার করতুম না। এবারে হরিদ্বারের কাছে হৃষীকেশে এদের খুব দৌরাত্ম্য হয়েছে এবং সন্ন্যাসীরাও খুব ব্যতি-ব্যস্ত হয়েছেন। সাধু-সন্ন্যাসীরা প্রায় সকলেই খালি গায়ে থাকেন ও যেখানে

সেখানে নিদ্রা যান। তাঁরা তাই ব্যস্ত হয়ে জানতে চেয়েছেন যে, বৃশ্চিক-দংশনের ওষুধ কি এবং কি করে তাদের বাসস্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। শীতকালেও আমি এদের বিন্ধ্যাচলের পাহাড়ে দেখেছি। সুতরাং এরা যে শুধু মানুষের কাছেই থাকে তা নয়, এদের প্রায় সর্বত্র সব ঋতুতেই দেখা যায়। এদের বিষ যে কত উগ্র হতে পারে সে সম্বন্ধে আমার একটি ঘটনা দেখা আছে। সেই কথা এখানে বলব :

ঘাটশীলার কাছে গালুডি বলে একটি স্থান আছে। পাহাড় জঙ্গলে ভরা দেশ, উঁচু-নিচু জমি, চতুর্দিকের দৃশ্য অতি মনোরম। তখন সেখানে এত বাড়ি ঘর হয়নি এবং জায়গাটি অতি স্বাস্থ্যকর ছিল। আমার এক অতি নিকট আত্মীয় তখন সপরিবারে সেখানে বাস করতেন। তাঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধে আমরা দিনকতকের জন্য গালুডিতে বেড়াতে গিয়েছিলুম।

সময়টা ছিল বর্ষার পরে। পূজোর তখনও কিছু দেরী আছে। যদিও বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে তবু জল শুকোয়নি। স্থানে স্থানে ছোট ছোট ডোবার আকারে বৃষ্টির জল জমে আছে। শরৎকালের শীত-গ্রীষ্ম মাখানো আবহাওয়া। দিনে সামান্য গরম ও রাত্রে সামান্য শীত করে। আমরা খুব বেড়াই ও খিদেও খুব হয়। আমার আত্মীয় কতকগুলি মুরগি পুষেছিলেন। তারা রাত্রে বাড়ির উঠোনে একটা ঘরে থাকতো, কিন্তু দিনে তারা উঠোনের বাইরে উঁচু-নিচু জায়গায় চরে বেড়াতো। বাড়িটি ছিল একটা ছোট টিলার ওপরে—আশে-পাশে জঙ্গল।

বেলা তখন প্রায় নটা, একদিন আমরা বাড়ির সামনে বসে গল্প-গুজব করছি। এমন সময় বাড়ির পেছনে উঠোনের বাইরে মুরগিদের

উচ্চ কলরব শুনতে পাওয়া গেল। আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম যে হয়ত কোন মুরগিতে ডিম পেড়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যে রোজই প্রায় সেই সময় মুরগিতে ডিম পাড়ে, এবং ডিম পাড়ার পর সেটা কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করে। কিন্তু ক্রমে বুঝলুম যে, সেদিনের ব্যাপার ঠিক তা নয়। প্রায় সব মোরগ-মুরগিগুলিই চীৎকার করছে যেন তারা কোন ব্যাপারে ভীষণ ভয় পেয়েছে। আমার আত্মীয় ও আমরা তাড়াতাড়ি দেখতে গেলুম যে, কি হয়েছে। গিয়ে দেখি যে, সব মুরগিই উঠোনের পাঁচিলের

ওপর উঠে বসেছে এবং বাইরের দিকে চেয়ে ভীষণ ডাকা-ডাকি করছে। আমরা ভাবলুম নিশ্চয় ওরা কোন নেকড়ে কিংবা শেয়াল দেখেছে। আমরা তাড়াতাড়ি বন্দুকটা এনে একটা কার্টিজ ভরে নিলুম। অতি সন্তর্পণে খিড়কির দরজা খুলে বাইরে চেয়ে দেখি কোথাও কিছু নেই। তখন আমরা বেরিয়ে পড়লুম এবং খুঁজতে লাগলুম যে কি দেখে মুরগি-গুলো ভয় পেয়েছে। আমাদের মধ্যে হঠাৎ একজন চেঁচিয়ে বললেন "ওরে বাস্ রে কি প্রকাণ্ড কাঁকড়া।" আমরা তাড়াতাড়ি সেই দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখি যে, একটা পাথরের ফাটল থেকে দুটো প্রকাণ্ড দাড়া বেরিয়ে আছে। আমরা সত্যিই চমকে গেলাম,—এত বড় কাঁকড়া হয়!

ভাবলুম, হয়ত আশে-পাশের ডোবা থেকে উঠে এসেছে। কিন্তু তাও কি সম্ভব? এ রকম কাঁকড়া একমাত্র সমুদ্রে দেখা যেতে পারে—হয়ত নদীতেও দেখা যেতে পারে, কিন্তু সুবর্ণরেখা নদী তো সেখান থেকে ছু মাইল দূরে। এ ব্যাটা কি এতটা রাস্তা হেঁটে চলে এসেছে?

আমার আত্মীয়টির খুব সাহস ছিল। তিনি বল্লেন, "আমি এখুনি ওটাকে ধরবো।" আমরা বল্লুম, "তুমি খুব সাবধানে যাও।" আমরা শুধু তার ছু'টো দাড়া দেখতে পারছিলুম, দেহটা পাথরের আড়ালে ঢাকা ছিল। কিন্তু আমাদের মনে কোন সন্দেহ ছিল না যে, যার দাড়া এত বড় তার দেহটাও নিশ্চয় প্রকাণ্ড হবে।

আমার আত্মীয় খুব বড় একটা চিম্‌টে নিয়ে এলেন এবং আমাদের বল্লেন যে, তিনি কাঁকড়াটাকে চিম্‌টে দিয়ে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন এবং আমরা যেন তাড়াতাড়ি সেটাকে ঘিরে ফেলি ও পালাতে না দিই। আমরা তাঁর কথামত ছোট ছোট লাঠি নিয়ে প্রস্তুত রইলুম।

আমার আত্মীয় অতি সন্তর্পণে ফ্রাটলের পেছনে গেলেন এবং হঠাৎ নিচু হয়ে চিমটে দিয়ে তার দাড়াটা চেপে ধরে এক হেঁচ্‌কা টানে বাইরে খোলা যায়গায় ফেলে দিলেন। আমরা Plan মত এগিয়ে যেতে গিয়েই থম্‌কে দাঁড়ালুম। এটা কালো লম্বা মত কিরে বাবা? এরকম লম্বা তো কাঁকড়া হয় না। সেটা অত দূর থেকে পড়ে আঘাত পেয়ে একটুখানি চুপ করে ছিল। এবার উঠে দাঁড়িয়ে ল্যাজটা পিঠের দিকে ধনুকের মত বেঁকিয়ে আস্তে আস্তে চলতে আরম্ভ করলে। তখন আমরা বুঝলুম যে এটা একটা প্রকাণ্ড কাঁকড়া বিছে—কিন্তু এটা কালো কেন? ভাল করে লক্ষ্য করে দেখি যে, সেটার গায়ে কালো কালো চুল রয়েছে। আমরা তো একেবারে অবাক—অনেক তো কাঁকড়া বিছে দেখেছি, কিন্তু তাদের গায়ে তো কখনও চুল দেখিনি! দেখা তো দূরের কথা শুনিওনি। আর তা ছাড়া এত বড় যে কাঁকড়া বিছে হয় তাও জানতুম না। আমরা স্থির করলুম যে, এটাকে মারা হবে না, জীবন্ত কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে।

আঘাতের জন্যই হোক বা চারিদিকে লোক দেখেই হোক সে ব্যাটা তখন স্থির হয়েছিল। তার পিঠে একটা বাঁখারি দিয়ে আমরা চেপে ধরলুম এবং আমার আত্মীয় সেটাকে খুব মোক্ষম করে চিমটে দিয়ে ধরে বাড়ির উঠানে নিয়ে এলেন। সেখানে তাকে একটা পুরোনো এ্যালুমিনিয়ামের ডেক্‌চি চাপা দিয়ে রাখা হল। সে ডেক্‌চিটার গায়ে একটা ফুটো ছিল এবং আমরা ভাবলুম যে, বাতাসের অভাবে সেটা মরে যাবে না। সাবধানতার জন্য আমরা ডেক্‌চিটার উপরে দুইখানি থান ইট চাপা দিয়ে রাখলুম যাতে সেটা ডেক্‌চিটাকে উল্টে বেরিয়ে আসতে না পারে। আমরা স্থির

করলুম যে, একটা ফলের বাস্কেটে করে তারপরদিন সেটাকে কলকাতায় নিয়ে আসবো।

আমরা দাঁড়িয়ে এই সব কথা বলাবলি করছি আর দেখি যে ডেক্‌চিতে খটাং খটাং করে শব্দ হচ্ছে। আমরা খুব কাছে গিয়ে অনুভব করে বুঝলুম যে, সেটা রাগে তার ইস্পাতের মত হুল দিয়ে ডেক্‌চিটাকে আঘাত করছে। এরকম প্রায় ঘণ্টাখানেক শব্দের পর আওয়াজটা থেমে গেল। আমরা ভাবলুম, যাক্ এইবার নিশ্চিন্ত, কালকেই ওটাকে কলকাতায় নিয়ে যাব।

বিকেলের দিকে আমরা আর একবার ডেক্‌চিটার কাছে গেলুম দেখতে যে, সেটা কি করছে, কিন্তু কোন সাড়া শব্দ পেলুম না। সকালের দিকে হুল মারার শব্দ বন্ধ হলেও মধ্যে মধ্যে একটু আধটু খড়্ খড়্ শব্দ শুনতে পারছিলুম যাতে বোঝা যাচ্ছিল যে বিছেটা বেঁচে আছে। কিন্তু এখন একেবারেই নিস্তব্ধ। ভয় হ'ল মরে গেল না তো? খুব সাবধানে ডেক্‌চিটার এক পাশ তুলে দেখলুম যে, বিছেটা পড়ে আছে, আর নড়ছে চড়ছে না! তখন সমস্ত ডেক্‌চিটা উঠিয়ে দেখলুম যে, সেটা মরে গেছে। মনে খুব দুঃখ হ'ল যে, এমন একটা অদ্ভুত জীব কাউকে দেখাতে পারলুম না। তখন

প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, আমরা বিছেটাকে ফেলে দিলুম আর চাকরটাকে ডেক্‌চিটা মেজে রাখতে বল্লুম। সে বল্লে যে, রাত্রে সে মেজে রেখে শোবে।

পরদিন সকাল বেলা ঠাকুর এসে বল্লে যে, বেলা সাতটা বাজে চাকরটা এখনও ওঠেনি আর উনুনও ধরায়নি, রান্না কখন চড়বে? আমরা বল্লুম,—"তুমি তাকে ডেকে তুলছো না কেন?" ঠাকুর বল্লে, "আমি তাকে ঢের ডাকাডাকি করলুম কিন্তু সে উঠছে না আর কোন সাড়াশব্দও দিচ্ছে না।" আমরা রেগেমেগে চাকরটার ঘরে গেলুম। আমরা গিয়ে দেখি সে একটা কাপড় আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। আমরা অনেক ডাকাডাকি করলুম, কিন্তু সে উঠলো না। বরঞ্চ সে বিড়্ বিড়্ করে কি বলতে লাগলো। তখন ঘরে খুব আলো হয়েছে। তাকে ঠেলে তুলে দেবার জন্য তার গা থেকে গায়ের চাদরখানা তুলে নিলুম। দেখি সে অজ্ঞান হয়ে আছে চোখ করমচার মত লাল ও গা পুড়ে যাচ্ছে। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করলুম যে, তার একটা হাত আঙ্গুল থেকে ঘাড় পর্যন্ত ভীষণ ফুলে আছে ও টক্‌টকে লাল। ঠিক যেন একটা ছোট ছেলের এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো পাশ বালিশ।

আমরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলুম ও তখুনি ডাক্তার নিয়ে এলুম। ডাক্তারবাবু তাকে পরীক্ষা করে বল্লেন যে, নিশ্চয় তাকে কোন রকম সাপে বা আর কোন বিষাক্ত প্রাণীতে কামড়েছে। আমরা তখন ডাক্তারবাবুকে কাঁকড়া বিছের গল্প বল্লুম এবং জানালুম যে, হয়ত এই ডেক্‌চি মাজার জন্যই এ রকম হয়েছে। ডাক্তারবাবু তখন তার ফোলা হাতটা ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলেন যে, তার সেই হাতের একটি আঙ্গুল সম্প্রতি কেটে গেছলো। তখন তিনি

বল্লেন যে, এই কাটার মধ্যে দিয়ে বিছের বিষ প্রবেশ করেছে। আমরা তাড়াতাড়ি সেই মাজা ডেক্‌চিটা এনে পরীক্ষা করলুম। দেখি যে তার চারিদিকে চালুনির মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছেঁদা। কাঁকড়া বিছেটা যতবার তার হুল ফুটিয়ে ছিল, ততবারই সেই ডেক্‌চিতে ছিদ্র হয়েছিল। বস্তুতঃ আমরা পরীক্ষা করে দেখেছিলুম যে, তার হুল ইস্পাতের মত শক্ত ও তীক্ষ্ণ।

ডাক্তারবাবু চাকরটাকে ইনজেক্‌সন ও অন্যান্য ওষুধ দিলেন। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা বাদে তার জ্ঞান হয়েছিল এবং পনের দিনের আগে সে সুস্থ হতে পারেনি।

যদি কাঁকড়া বিছেটা চাকরটাকে সরাসরি হুল ফুটাতে পারত তা হলে তার কি অবস্থা হতো? আমার মনে হয় নিশ্চিত মৃত্যু। পরে চাকরটার কাছে শুনেছিলুম যে সে রাত্রে ডেক্‌চি মেজে শোবার পর তার সেই কাটা আঙ্গুলটা অল্প অল্প চুলকাতে ও জ্বলতে আরম্ভ করে। পরে কি হয়েছিল তা আর তার মনে নেই।

কাঁকড়া বিছের গায়ে যে চুল হয় একথা শুনে অনেকে হয়ত আশ্চর্য বোধ করবেন। কিন্তু মাকড়সার গায়ে যে চুল হয় তা' আমি স্বচক্ষে দেখেছি। গত বৎসর গরমের সময় শিলং-এ এক রাত্রে রাজভবনে ডিনারের পর আমি, আমার কন্যা, বৌমা এবং রাজ্যপাল জয়রামদাস দৌলতরাম নিচেকার হল ঘরে রাজ্যপালের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ভ্রমণের ফিল্ম দেখছিলুম। হঠাৎ দেখলুম একজন চাপরাশী একটা পুরু তোয়ালে মেজের উপর ফেলে দিয়ে কি একটা মুঠো করে ধরল। আমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখলুম যে, সে একটা খুব বড় কালো মাকড়সা ধরছে। তার শরীর মখমলের মত এবং কালো কালো লোমে পরিপূর্ণ।

প্রায় এই রকমের মাকড়সা আমাদের যশোর জেলার অমৃত-বাজার গ্রামে একবার দেখেছিলুম তার গায়েও লোমের মত ছিল দেখতে কালো ও বেশ বড়। একদিন আমরা আমাদের খিড়কির বাগানের ভেতর ঢুকেছি বিকেলবেলায়। বাগানটা আমাদের বাপ খুড়োর আমলে খুব ভালই ছিল। এখন জঙ্গলে ভর্তি। চন্দ্রবোড়া সাপ এমন কি সময় সময় চিতাবাঘও দেখা যায়। এখানে দেখলুম যে, একটা আমগাছে ছুটো ডাল জুড়ে প্রকাণ্ড এক জাল পাতা আর তার মধ্যে একটি মকড়সা বসে আছে। এর পেটটা ভারিমত আর লম্বা লম্বা পাগুলি কালোর ওপর হলদে ডোরা কাটা আর পায়ে ছুঁচলো নখ। আমরা জালে হাত দিয়ে দেখলুম যে, বেশ শক্ত সহজে ছেঁড়ে না। মাকড়সার কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই, তিনি দিব্যি বসে আছেন। আমরা একটা বেত নিয়ে তাকে খোঁচা দিলুম। সেটা না পালিয়ে একটু কুঁকড়ে বসল আর হঠাৎ পুচ ক'রে একটু কুলকুচোর মত করলে! আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখলুম যে, বেতের আগার দিকটা হলদে রঙের রসে ভিজে গেছে। আমরা অবার খোঁচা মারলুম এবং সেটাও তখুনি সেই হলদে রঙের রস ছুঁড়ে মারলে। তার পরে মাকড়সাটা তীর বেগে জালের উপর দিয়ে দৌড়ে গিয়ে আমগাছের একটা ডালের ভিতর লুকিয়ে পড়ল। আমাদের সঙ্গে একজন বৃদ্ধ চাষী ছিল। সে বল্লে—"ঐ হলদে রসটা হচ্ছে তীব্র বিষ, কোন ঘায়ে লাগলে আর রক্ষে নেই, এমন কি শুধু গায়ে লাগলেও বিশ্রী ঘা হবে।" আমরা অবশ্য পরীক্ষা করে দেখিনি।

ছোট পাখীর ভালবাসা

পাখীর ভালবাসার কথা বলতে গেলে সবার আগে মনে পড়ে চক্রবাক ও চক্রবাকীর কথা। যাঁরা শিকারী তাঁরা জানেন যে, এই চকা-চকীর মধ্যে একটাকে গুলি করলে আর একটা সেখান থেকে পালিয়ে যায় না,—তার মৃত সঙ্গীটির উপর ঘুরে ঘুরে উড়তে থাকে। আমি স্বচক্ষে এই দৃশ্য দেখেছি এবং হয়ত চেষ্টা করলে এই উড়ন্ত পাখীটাকে মারতেও পারতুম, কিন্তু এরূপ অবস্থায় বোধ হয় কোন শিকারীর মনে সে প্রবৃত্তি জাগে না। কয়েক বছর আগে আমি একটি ছোট পাখীর ভালবাসার যে অপূর্ব নিদর্শন পেয়েছিলুম, সেই কথাই আজ বলবো।

তখন যুদ্ধের আগে, সস্তা-গণ্ডার দিন। একদিন আমার বাগানে বসে বসে ভাবলুম যে, এখানে কিছু পাখী পুষলে মন্দ হয় না।

বাগানে প্রচুর জায়গা ও গাছপালা রয়েছে,—এখানে ইচ্ছা করলে এমনভাবে পাখী পোষা যায় যাতে তারা অনেকটা স্বাভাবিকভাবে থাকতে পারে। বাগানের একদিকে একটা ঝাঁকড়া ডুমুর গাছ ছিল, আর তার তলায় ছিল চমৎকার ঘাস। ভাবলুম, আমি যদি এই ডুমুর গাছটাকে জাল দিয়ে ঘিরে ফেলতে পারি এবং তার তলায় একটি ছোট সরু খালের মত করে দিতে পারি, তাহলে পাখীগুলি খুব আনন্দে থাকতে পারবে। যেমনি মনে হওয়া, তৎক্ষণাৎ কার্যারম্ভ। দিন দুয়ের মধ্যেই ডুমুর গাছটি ছোট ফুটো-ওয়ালা জাল দিয়ে ঘেরা হয়ে গেল এবং মাটির 'লেভেলে' গড়ানে চৌবাচ্ছাও খোঁড়া হয়ে গেল, যাতে খুব ছোট পাখীদেরও জল খেতে অসুবিধা না হয়। তারপর মিউনিসিপ্যাল মার্কেট থেকে নানা জাতের ও নানা রকমের পাখী এনে ছেড়ে দিলুম তার মধ্যে।

আমার স্বভাব হচ্ছে, যখন একটা নূতন শখ পেয়ে বসে, তখন দিনকতক তাতে খুব আগ্রহ থাকে। এই ঘটনার পর বাগানে গেলে আমি প্রায়ই সেই ডুমুর গাছটার কাছে বসে পাখীদের খেলা ও ডাকাডাকি লক্ষ্য করতুম। একদিন অনুভব করলুম যে তাদের বেশী কাছে থাকলে তারা কেমন আড়ষ্ট হয়ে যায়, বেশী লাফালাফি বা ডাকাডাকি করে না। তাই তখন থেকে তাদের একেবারে কাছে না গিয়ে খানিকটা দূরে একটা গাছতলায় বসে তাদের লক্ষ্য করতুম।

একদিন বিকেলে ৩।৪টার সময় আমার জায়গা থেকে বসে বসে পাখীদের দেখছি, এমন সময় মনে হল যে, একটা ছোট পাখী যেন খাঁচার বাইরে এসে পড়েছে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না, কারণ এত বড় গাছটা ঘিরতে তারের জালে জালে অনেক জায়গায়

জোড় দিতে হয়েছিল, এই সব জোড়ের কোন একটা মুখ থেকে এই ছোট পাখীটার বেরিয়ে আসা আশ্চর্য ছিল না। আমি দেখলুম যে ছোট পাখীটা খাঁচার বাইরে জালের উপর বসে আছে। কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে আছি, এমন সময় এমন এক দৃশ্য দেখলুম যে, সমস্ত মনটা সচকিত হয়ে উঠলো। এই পাখীটা ছিল একটা টুন-

টুনি, সেটা খাঁচার বাইরে বসে পিক্‌পিক্ করে ডাকছে, আর তার ঠিক নিচেই খাঁচার ভিতরদিকে তার জোড়াটি দু' পায়ে জাল আঁকড়ে ধরে ডেকে ডেকে তাকে কি বলছে। তাদের ভঙ্গী দেখে আমার মনে কোন সন্দেহ রইল না যে, তারা দুটিতে ইশারা করে কি যেন বলাবলি করছে এই ঘটনার একটু পরেই বাইরের পাখীটা উড়ে গিয়ে

১০।১২ হাত দূরে একটা নেবু গাছে বসলো এবং খুব ডাকাডাকি করতে লাগলো। সে যে তার জোড়াটাকে সেখানে আসতে ডাকছে তাতে আর কোন সন্দেহ রইলো না আমার। কিন্তু হায়! তার সঙ্গিনী যে বন্দিনী,—সে কি করে বেরিয়ে আসবে? যখন দেখল যে সে আসছে না, তখন বাইরের পাখীটা খাঁচার চালে গিয়ে উড়ে বসলো এবং আবার আমি দেখলুম সেই অপরূপ দৃশ্য। পাখী দু'টি বাইরের ও ভিতরের জাল আঁকড়ে ধরে ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে কি বলাবলি করছে। একটু পরে বাইরের পাখীটা আবার নেবু গাছে গিয়ে বসলো এবং পিক্‌পিক্ করে ডাকতে লাগলো। খাঁচার পাখীটাও পিক্‌পিক্ করে উত্তর দিচ্ছে, কিন্তু বেরুবার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না। আবার বাইরের পাখীটা খাঁচার উপর বসলো। সেই পুরাতন দৃশ্য। আমি খালি ভাবছি যে, কেন তার জোড়াটিকে সে যে জায়গা দিয়ে বেরিয়ে গেছলো তা দেখিয়ে দিচ্ছে না, কিন্তু ভগবান তাকে বোধ হয় সে বুদ্ধিটুকু দেননি, তাই সে বার বার খাঁচা থেকে নেবুগাছে উড়ে যাচ্ছে আর ডেকে ডেকে বলছে তার সঙ্গীটিকে বেরিয়ে আসতে। কিন্তু সে বেচারী কি করবে, সে তো বেরিয়ে আসবার রাস্তা জানে না! আমি তন্ময় হয়ে সেই দৃশ্য দেখতে লাগলুম—একবার নয়, দু'বার নয়, অসংখ্য বার। ক্রমে সন্ধ্যে হয়ে এলো, ভাবতে লাগলুম কি করা যায়, কি করে দুটির মিলন ঘটাতে পারি। একবার মনে হ'ল যে, ভেতরের পাখীটাকে ছেড়ে দিই। কিন্তু তা কি করে হবে, সে ডুমুর গাছের উঁচু ডালে বসে, তাকে ধরবো কি করে? কিন্তু আমি যা অসহায়ভাবে ইচ্ছে করছিলুম হয়ত শ্রীভগবানেরও সেই ইচ্ছে ছিল। হঠাৎ দেখলুম বাইরের পাখীটা খাঁচার উপরে আবার উড়ে

এলো, কিন্তু অন্যবারের মত আবার নেবু গাছে ফিরে গেল না। আমি অবাক হয়ে দেখতে লাগলুম যে, এবার সে কি করে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে ভাল ক'রে বুঝতে পারলুম না যে, কি ক'রে কি হ'লো, কেমন করে যেন বাইরের পাখীটা ভিতরে ঢুকে পড়লো। সে যে জোড়ের মুখ দিয়েই ভিতরে ঢুকে পড়েছিল তাতে আর আমার সন্দেহ ছিলো না। আমি খাঁচার কাছে দৌড়ে গেলুম ; গিয়ে যে দৃশ্য দেখলুম তাতে অশ্রু সম্বরণ করতে পারলুম না। দেখি যে, পাখী দু'টি একটি সরু ডালে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছে, আর আনন্দে ডাকাডাকি করছে। মুগ্ধ হয়ে ভাবলুম, এই ছোট পাখীটার ভালবাসার কথা। সে বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিল এবং প্রাণপণে সঙ্গিনীর মুক্তি চাইছিল। কিন্তু যখন সে দেখলে যে, তাকে বাইরে আনতে পারলে না, তখন সে নিজে আবার বন্দীত্বে ফিরে এলো। সে তার মুক্তি ও সঙ্গিনীর মধ্যে সঙ্গিনীকেই কামনা করেছিল মনপ্রাণ দিয়ে।

আর একটি কথা বলে এই লেখা শেষ করবো। পরদিন এই পাখী দুটোকে ছেড়ে দিতে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছিলুম, কিন্তু কিছুতেই তাদের ধরতে পারিনি, ফলে আমাকে ডুমুর গাছের জালটাকে সম্পূর্ণ খুলে নিয়ে, সমস্ত পাখীগুলিকেই মুক্তি দিতে হয়েছিল।

আমার "বাঘ" শিকার

আমাদের অমৃতবাজার গ্রামের পনেরো ষোল মাইল দূরে একবার বাঘের উপদ্রবের কথা শোনা গেল। আজকে বাছুরটা, কালকে ছাগলটা, পরশু একটা কুকুর হারাতে লাগল। যেখানে এই অত্যাচার হচ্ছিল সেই গ্রামের লোকেরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। সেই গ্রামের যিনি জমিদার তিনি বিখ্যাত শিকারী ছিলেন। কিন্তু সেই সময় তিনি অসুস্থ থাকায় বাঘটার কিছুই করতে পারেন নি।

সে সময়টা ছিল বর্ষার পরেই, পুজোর কিছু আগে। বৃষ্টির পর গ্রামের চতুর্দিকে জঙ্গলে ভরে গিয়েছে। সেই জন্য বাঘটা যে কোথায় লুকিয়ে থাকত কেউই দেখতে পেত না। গ্রামের

দক্ষিণ দিকে একটি বিরাট বাঁওড়। আমাদের যশোর জেলায় জলাভূমিকে বাঁওড় বলে থাকে। এই সব বাঁওড় বর্ষাকালে নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, পরে জল শুকিয়ে গেলে নদীর সঙ্গে এর সংযোগ ছিন্ন হয়।

বাঁওড়ে বহু জলজ উদ্ভিদ্ জন্মায়, সেই জন্য এর মধ্যে কোথাও বা গভীর জঙ্গল কোথাও বা পরিষ্কার জল। এই জল কোন জায়গায় হাঁটু-জল ও স্থানে স্থানে অত্যন্ত গভীর। গ্রামের দিকটি ছাড়া এই বাঁওড়ের তিন পাশ গভীর জঙ্গলে আবৃত। গ্রামের দিকটাও পরিষ্কার ছিল না, সেদিকেও অল্প-স্বল্প জঙ্গল ছিল। এই জঙ্গলের গাছপালা অধিকাংশ বেত ও কাঁটা-বাঁশ। সেই জন্যে মানুষের দুর্ভেদ্য ছিল। এর ভেতর জন্তু-জানোয়ার কি আছে গ্রামবাসীর কেবল কল্পনার বিষয় ছিল।

সেই গ্রামে আমার এক আত্মীয় ছিলেন। একদিন সকালে আমি সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। দেখি যে, তাঁর বৈঠকখানায় কিসের এক জটলা হচ্ছে। আমি শুনলাম যে, তিন চার দিন আগে সন্ধ্যেবেলায় এক জনের একটি পোষা কুকুরকে বাঘে নিয়েছে। কুকুরটি বাঁওড়ের দিকে বেড়াতে গিয়েছিল, কিন্তু আর ফিরে আসে নি। যাঁর এই শখের কুকুর খোওয়া গিয়েছে তিনি অতিশয় রুষ্ট হয়ে ব'লছিলেন, "এ রকম হ'লে ত গ্রামে টেঁকা যায় না। মানলুম জমিদারবাবুর অসুখ হয়েছে, কিন্তু তাই ব'লে কি গ্রামে এমন লোক কেউ নেই যে বাঘটা মারতে পারে? এর আগেও ত বাঘের উপদ্রব হয়েছে, কিন্তু কিছু দিন পরেই বাঘটা হয় মারা পড়েছে কি অন্যত্র চলে গেছে। এবার নাগাড়ে অত্যাচার চলছে। মানুষ আর কত দিন সহ্য করতে পারে?"

আমাকে দেখে আমার আত্মীয় বল্লেন, "এই যে বাবাজী, তুমি এসেছ। আমাদের এই বাঘটা মেরে দাও না?"

আমি বাঘ মারব শুনে আমার হাসি এল। আমি যে কি রকম শিকারী তা না বলাই ভাল। আমি ঘুঘুটা-আসটা মেরে থাকি, কখনও বা খরগোস বা সজারু। তখনও এর চেয়ে বড় জন্তু আমি শিকার করি নি, যদিও পরে আমি ছ'চারটা হরিণ মেরেছি। বাঘ তো আর নিরীহ জন্তু নয় যে আমি ফসকে গেলাম আর সে বাড়ি চলে গেল? আমি বল্লাম, "আমায় ক্ষমা করবেন, বাঘ মারা আমার কর্ম নয়।" কিন্তু গ্রামের লোকেরা ছাড়ে না, তাঁদের অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। বিশেষতঃ যাঁর কুকুর হারিয়েছিল তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। তাঁরা সমবেত ভাবে আমাকে বিশেষ করে বলতে লাগলেন যে, যাতে আমি তাঁদের বিপদ থেকে রক্ষা করি। তাঁরা বল্লেন, "আপনি ভাবছেন কেন? টিপ নিয়ে কথা। যে পায়রার গায়ে গুলি লাগাতে পারে সে কি আর বাঘের গায়ে গুলি লাগাতে পারে না? যদিও একথা সত্যি যে বাঘ আক্রমণ করতে পারে কিন্তু তারও বন্দোবস্ত করা যায়। আপনাকে একটা বড় গাছে উঠিয়ে দেব, আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকবেন।"

মানুষের মনে বাহাতুরী নেবার একটা সতত আকাঙ্ক্ষা থাকে। ভাবলাম, দেখি না চেষ্টা করে, যদি ফাঁকতালে বাঘশিকারী হওয়া যায় ত মন্দ কি! তা ছাড়া তাঁরা এমন ভাবে ধরাধরি করতে লাগলেন যে, তাঁদের অনুরোধ এড়ান তুষ্কর। অগত্যা রাজী হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে কি করতে হবে? তাঁরা বল্লেন যে অত্যাচারটা ধাঁওড়ের দিকে হয়ে থাকে এবং বাঘটা

নিশ্চয় ঐখানে লুকিয়ে আছে। স্থির হল যে আমি বাঁওড়ের ধারে কোন গাছে উঠে বন্দুক নিয়ে বসে থাকব এবং গ্রামের লোকেরা হৈ-চৈ করে বাঘটাকে তাড়িয়ে বার করবে। আমার আত্মীয় বল্লেন, তাঁর অনেক মুসলমান ঢালী প্রজা আছে। তারা খুব সাহসী এবং আবশ্যক হলে তারা কাঁটা-খোঁচা না মেনে জঙ্গলে প্রবেশ করতে পশ্চাৎপদ হবে না।

যদিও আমার বুক গুর-গুর ক'রছিল, তবুও রাজী হয়ে গেলাম। কিন্তু আমার আত্মীয় আমাকে যে বন্দুক দিলেন তা দেখে আমার চক্ষু স্থির। বন্দুকটি গাদা বন্দুক, যা একবারের বেশী ছু'বার ফায়ার করা যায় না। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আমাদের অঞ্চলে খুব বড় বাঘ আসে না। চলিত কথায় যাকে গো-বাঘা বলে, অর্থাৎ চিতা জাতীয় বাঘ—এই রকম ছোট বাঘই দেখা যায়। এরা ছাগল, ভেড়া, কুকুর নিয়ে যায়, কখনও মানুষ মেরেছে বলে শুনি নি। তবে আঘাত পেলে যে মানুষকে আক্রমণ করবে না, এমন কথা কে বলতে পারে?

এর পরও আমার আশ্চর্য হবার কারণ ছিল। অনেক খুঁজেও বন্দুকের কোন গুলি পাওয়া গেল না। আমি ভাবলুম যাক বাঁচা গেল, আমাকে আর বাঘ মারতে হবে না। কিন্তু গ্রামের 'ইঞ্জিনিয়ার'রা, হার মানবার পাত্র নন, তাঁরা মাছ ধরবার জালের একটি লোহার কাঁটি নিয়ে এলেন এবং হাতুড়ি দিয়ে পিটে-পিটে কাঁটিটাকে খানিকটা গোল মত করলেন। তার পর সেই 'গুলি' বন্দুকের নলের মধ্যে পুরে বারুদ দিয়ে বেশ করে গাদা হল। এই 'একাঘ্নি' নিয়ে আমি গ্রামের লোকের সঙ্গে শিকারে যাত্রা করলাম।

বাঁওড়ের কাছে গিয়ে দেখি যে, পাতলা জঙ্গলের ভেতর, ঠিক গভীর জঙ্গলের ধারে. একটা সুন্দর কাঁঠাল গাছ রয়েছে। একটা মইয়ের সাহায্যে গাছে উঠলাম ও দুটো মোটা ডালের সংযোগস্থলে বসে পড়লাম। এই উঁচু জায়গায় বসে মনে কতকটা সাহস হল। ভাবলাম যে, বাঘটা এখন সহজে আর আমার কিছু করতে পারবে না। আমি ভাল ভাবে বসে জঙ্গলের মধ্যে চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলাম। আর গ্রামের কতকগুলি সাহসী যুবক বাঁওড়ের দিক থেকে হৈ-চৈ করে বন ঠেঙ্গাতে স্বুরু করল। এই কাঁঠাল গাছের নিকটেই সেই শখের কুকুরটি নিরুদ্দেশ হয়েছিল। সেই জন্যে আমাদের আশা ছিল যে, এইখানেই বাঘ বার হবে।

যাঁরা শিকারী তাঁরা জানেন যে, গভীর জঙ্গলের মধ্যেও জন্তু-জানোয়ারদের চলাফেরা করবার পথ থাকে। এই সব পথ এঁকে-বেঁকে গিয়েছে, কিন্তু এই পথ এমন মসৃণ যে জানোয়াররা এই পথে চললে বিন্দুমাত্র শব্দ হয় না। বিপথে গেলে জানোয়ারের পায়ের শব্দ পাওয়া যায়। সেই জন্যে অনেক সময় এরূপ হয় যে জানোয়ার তাড়া খেয়ে অল্পক্ষণ হুটপাট করে পরে নিঃশব্দে চলে যায়। এর কারণ এই যে, কিছু রাস্তা বিপথে চলে নিজেদের বাঁধা রাস্তায় পড়ে, তখন আর তাদের চলায় কিছুমাত্র শব্দ হয় না।

জঙ্গলের ভেতরটা অন্ধকার মত ছিল বলে আমি প্রথমটা বেশী কিছু দেখতে পাই নি। পরে চোখ ঠিক হলে বনের ভেতরটা বেশ স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। আমি দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম যে, আমার ঠিক সামনে ২০।২৫ হাত দূরে একটা

শুঁড়ি-পথ দেখা যাচ্ছে। এই পথের দু'ধারে কাঁটার জঙ্গল কিন্তু পথটি খোলা ও পরিষ্কার। শুধু তাই নয়,—চলা-ফেরা করলে রাস্তা যেমন পেটানো বলে বোধ হয়—এই শুঁড়ি-পথটাও অনেকটা সেইরূপ তেলা-তেলা ছিল। আমি নিশ্চিত বুঝলাম যে, বাঘকে এই পথ দিয়েই আসতে হবে। আমি যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে আড়াআড়ি ভাবে বিস্তৃত শুঁড়ি-পথটার মাত্র এক হাতের মত পরিসর-স্থান দেখা যাচ্ছিল। বাকি পথটা জঙ্গলে ঢাকা। বাঘকে সেই পথ দিয়ে যেতে হলে আমার চোখে অন্ততঃ একবার পড়তেই হবে। আমি বন্দুকের ঘোড়া তুলে সেই শুঁড়ি-পথে যে এক হাত পরিমাণ রাস্তা দেখা যাচ্ছিল সেই দিকে লক্ষ্য রেখে প্রস্তুত হয়ে বসলাম, যাতে বাঘটা সেই ফাঁকা জায়গাটুকু পার হতে গেলে তাকে গুলি করতে পারি।

ওদিকে গ্রামের লোকদের হৈ-হৈ শব্দ ক্রমেই নিকটবর্তী হতে লাগল। এইরূপে ২০।২৫ মিনিট কেটে গেল। হঠাৎ দেখলাম যে, সেই ফাঁকা শুঁড়ি-পথে কি যেন একটা নড়ছে। মেটে-মেটে রং ও তার ওপর সাদা সাদা ডোরা কাটা। আমি ভাবলাম এ কি রকম বাঘ! কিন্তু তখন আর বেশী চিন্তা করবার সময় ছিল না। আমি বুঝেছিলাম যে, আমাকে এখনই গুলি করতে হবে ও লক্ষ্যভেদ করতে হবে। পূর্বেই বলেছি যে আমার দ্বিতীয় বার গুলি করবার উপায় নেই।

আমার যত দূর সাধ্য লক্ষ্য স্থির করে বন্দুকের আওয়াজ করলাম। বন্দুকের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে, জন্তুটির যেখানে গুলি লাগল সেখানটা প্রথমটা সাদা ও পরে রক্তাক্ত হয়ে

গেল। গুলি খেয়ে জন্তুটি তাড়াতাড়ি চলতে লাগল এবং আঘাত-স্থান শীঘ্রই জঙ্গলের আড়ালে পড়ল। কিন্তু এ কি! তার দেহ যে শেষ হয় না! জন্তুটি কত লম্বা? আমি এরূপ ভাবছি, এমন সময় বাঁওড়ের অপর দিক থেকে ভীষণ কোলাহল শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ১০।১২ জন লোক আমার গাছের কাছে দৌড়ে এসে বল্লে, "আপনি শীঘ্র মই দিয়ে নেমে আসুন। এটা বাঘ নয়, প্রকাণ্ড অজগর!" আমি তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে তাদের সঙ্গে ছুটলাম।

সাপটা জঙ্গলের যে ধার থেকে বার হয়েছে তার এক দিকে ফাঁকা মাঠ আর অপর দিকে মেথর-জাতীয় অতি দরিদ্রের কয়েকটি কুটির ছিল। এই কুটিরগুলির প্রায় ১০০ হাত দূরে আবার পাতলা জঙ্গল আরম্ভ হয়েছে। সেই পাতলা জঙ্গলে প্রথমে একটা ডোবা মত ছিল, এইখানে গ্রামের ময়লা ফেলা হ'ত এবং এই ডোবার মধ্যে অল্প জল, বুনো কচু ও আশ্‌সেওড়ার ঘন জঙ্গল ছিল।

আমরা দৌড়ে এসে দেখি যে, সেই বিরাট সাপটা গভীর জঙ্গল থেকে বার হয়েছে ও আস্তে আস্তে গরীব লোকদের কুঁড়েঘরের দিকে যাচ্ছে। ততক্ষণে অনেক লোক এসে জমে গেছে কিন্তু সাপের ভ্রূক্ষেপ নেই। সাপটি ২০।২৫ হাত লম্বা ও সেই পরিমাণে মোটা। তাকে আটকায় কার সাধ্য? আমারও এমন ক্ষমতা নেই যে আবার গুলি করি। আমরা নিরাপদে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে এই অদ্ভুত দৃশ্য উপভোগ করছি। এই জাতীয় সাপ বেশী জোরে চলতে পারে না এই ছিল আমাদের ভরসা।

এমন সময় এক হৃদয়-বিদারক ঘটনা ঘটল—যা মনে করলে

আজও আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয় এবং অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হয় এই জন্য যে,—আমি সাপটাকে গুলির খোঁচা মেরে ক্রুদ্ধ করে না দিলে হয়তো এরূপ দুর্ঘটনা ঘটত না। সত্য কথা বলতে কি, আমার বন্দুকের গুলি অত বড় সাপটার কিছুই ক্ষতি করতে পারে নি। কেবল তাকে উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ করেছিল মাত্র।

সামনের দিকে একটা কুঁড়েঘরের একটা খোলা দাওয়ায় মেথরদের ১৫।১৬ বছরের একটা ছেলে ঘুমোচ্ছিল। জ্বর হয়েছিল বলে এত চীৎকারেও তার ঘুম ভাঙ্গে নি। সাপটা চলে যেতে হঠাৎ ঘুরে ঐ কুটিরের দিকে অগ্রসর হল এবং ঐ ঘুমন্ত ছেলেটার উরুত কামড়ে ধরল। তার পর যেমন ব্যাঙ মুখে করে চলে যায় সেভাবে ছেলেটাকে মুখে করে শূন্যে তুলে চলতে আরম্ভ করল। ছেলেটা যন্ত্রণায় একবার চীৎকার করেই এবং সাপের বিকট চেহারা দেখে তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হয়ে গেল।

আমরা স্তম্ভিত ও হতজ্ঞান হয়ে দেখছিলাম। এরকম ব্যাপার যে হতে পারে, তা আমরা একবারও ভাবি নি। তাছাড়া এই ব্যাপারটা যেন বিদ্যুতের মত ঘটে গেল। আমাদের চমক ভাঙ্গলে আমরা বুঝলাম যে, এখনই সাপটাকে আটকাতে হবে। নইলে ছেলেটার নিস্তার নেই। তখন যে যা' পেল তাই নিয়ে ছুটে সাপের সামনে দৌড়িয়ে গেল ও তার গতিরোধের চেষ্টা করতে লাগল। গ্রামের লোকেরা মরিয়া হয়ে সাপটাকে বাধা দিতে লাগল, যাতে সে কোন রকমে সেই ময়লাপূর্ণ ডোবাটার দিকে না যেতে পারে। সকলেই বুঝেছিল যে সেখানে কোন গর্তের মধ্যে সাপটার বাসা। সেখানে একবার

ঢুকতে পারলে তাকে ধরা অসম্ভব এবং ছেলেটাকে বাঁচানো যাবে না। সেই জন্য তারা লাঠি-সোঁটা নিয়ে সাপটার সামনে গিয়ে তাকে আটকাতে লাগল। ছেলেটা সাপটার মুখে থাকাতে, তার আর কামড়াবার-জো ছিল না, আর সেইজন্যেই নির্ভয়ে গ্রামের লোকেরা সাপটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিল।

তারা বাধা দিচ্ছে আর অজগরটি এদিক-ওদিক করে তাদের পাশ কাটাবার চেষ্টা করছে। যখনই কোন ফাঁক পাচ্ছে তখনই ২।৪ হাত অগ্রসর হচ্ছে। এইরূপে গ্রামের লোকদের প্রবল বাধা সত্ত্বেও সাপটা তার বাসার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগল।

গ্রামের লোকেরা যখন স্থির বুঝল যে, আর বেশীক্ষণ সাপটাকে বাধা দেওয়া যাবে না তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলল যে এখনই একবার জমিদারবাবুকে খবর দেওয়া হোক। তাঁর কাছে ভাল ভাল বন্দুক ও রাইফেল আছে। যদিও তিনি অসুস্থ, তা হলেও একটা লোকের প্রাণ যাচ্ছে শুনলে তিনি না এসে থাকতে পারবেন না। আমার আত্মীয় বল্লেন, "এ খুব ভাল কথা" এবং তখনই দুই জন লোককে জমিদারবাবুকে ডাকতে পাঠালেন।
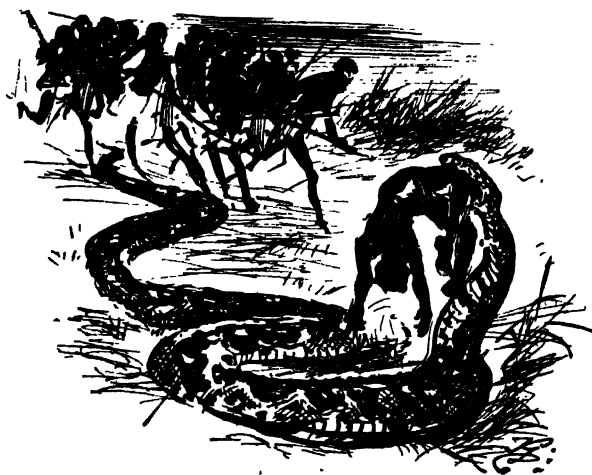
আমার আত্মীয় গ্রামের লোকদের ডেকে বল্লেন,—"এস ভাই, আমরা সকলে প্রাণ পণে সাপটাকে বাধা দিই। অন্ততঃ

যতক্ষণ না জমিদারবাবু আসেন ততক্ষণ আমরা সাপটাকে কিছুতেই ডোবার নিকট যেতে দেব না।" এ বিষয়ে সকলে একমত হয়ে তাদের যথাকর্তব্য করতে লাগল। সাপটা খুব লম্বা ও মোটা। তার দেহটা লম্বা হয়ে আছে, আর তার মুখ ছেলেটাকে কামড়িয়ে শূন্যে উঠে আছে। তার বিরাট দেহ গুটিয়ে গুটিয়ে আস্তে আস্তে চলেছে। আমি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

এই সময়ে কয় জন লোকের সঙ্গে প্রৌঢ় জমিদারবাবু এসে পৌঁছলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর এক কর্মচারীও ছিল যিনি জমিদারবাবুর শিকারের নিত্যসঙ্গী।

জমিদারবাবু এসেই সমস্ত ব্যাপারটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করলেন এবং তৎক্ষণাৎ কয়েকটা লোককে তাঁর বাড়ি থেকে ও গ্রামের অন্য লোকের বাড়ি থেকে যে ক'খানা বলিদানের খাঁড়া পাওয়া যায়, তা নিয়ে আসতে বল্লেন। তারা ছুটে চলে গেল। জমিদারবাবু আমার আত্মীয় ও গ্রামের অন্যান্য মাতব্বরদের তাঁর মতলব বুঝিয়ে বল্লেন। তিনি বল্লেন,—"সাপটাকে গুলি করে মারা কিছুমাত্র শক্ত নয়। সাপটা এখন যে অবস্থায় পড়েছে, তাতে তার গায়ে রাইফেল ঠেকিয়ে গুলি করলেও তার বাধা দেবার ক্ষমতা নেই। গুলি করলে সাপটা নিশ্চিত মরবে বটে, কিন্তু মানুষটাকে বাঁচাতে পারা যাবে না। সাপ গুলি খেয়ে মরবার আগে মানুষটাকে ল্যাজ দিয়ে জড়িয়ে পিষে মারবে। অতএব এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সে তা না করতে পারে।"

এমন সময় আট-দশ খানি খাঁড়া এসে পৌঁছল। এই খাঁড়াগুলি যেমনি ভারী তেমনি ধারালো। তিনি সেই খাঁড়াগুলি কতকগুলি বলিষ্ঠ যুবকদের হাতে একখানি করে দিয়ে সাপটার দেহের স্থানে স্থানে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তিনি বল্লেন, "ইশারা করলেই তোমরা নিজ নিজ স্থানে সাপটার দেহে পুনঃপুনঃ আঘাত করতে থাকবে যতক্ষণ না সাপটার দেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়।" জমিদারবাবু বুঝিয়ে বল্লেন যে, তাঁর ইশারা অর্থাৎ সিগন্যাল হচ্ছে বন্দুকের আওয়াজ।

সকলে তাদের যথাকর্তব্য বুঝে, নিজ নিজ স্থানে খাঁড়া হাতে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। জমিদারবাবু সাপটার অতি নিকটে গিয়ে বড় রাইফেল দিয়ে তার ঘাড়ে গুলি করলেন। গুলি লাগল সাপের মুখের মাত্র তিন হাত তফাতে এবং সেই জায়গাটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সাপের দেহের দশ জায়গায় উপর্যুপরি খাঁড়ার কোপ পড়ে সাপটা দশ টুকরা হয়ে গেল। এইরূপে সেই বিরাট রাক্ষসের প্রাণান্ত ঘটল।

এইবার মানুষটিকে বাঁচাবার পালা। সাপের মুখেতে বাঁশ পুরে দিয়ে অনেক কষ্টে সেই ছেলেটাকে বার করা হল। বহু শুশ্রূষার পর তার জ্ঞান হল। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে যশোরে পাঠানো হল। সেখানে তিন মাস চিকিৎসার পর লোকটা ভাল হয়েছিল বটে, কিন্তু যে উরুতে সাপে কামড় বসিয়েছিল সে পা খানি ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে সরু হয়ে গিয়েছিল।

এ কথা অবশ্য বলতে হবে না যে এই সাপটা মারবার পর গ্রামের লোকদের ছাগল, ভেড়া, কুকুর আর 'বাঘে' নিয়ে যায় নি।

আমি তখন ইনফেন্ট ক্লাসে পড়ি। অর্থাৎ তখনকার দিনে স্কুলের সবচেয়ে নিচু ক্লাস। সে সময়ে আমি শ্যামপুকুরের কোন স্কুলে কিছুদিন প'ড়েছিলুম। স্কুলটি খুব বড় ছিল না এবং কোন কোন ক্লাসে ছেলেও খুব কম ছিল। আমার ঠিক উপর ক্লাসে আমার এক জ্ঞাতি ভাই পড়ত। আমরা দু'জনে প্রায় এক বয়সীই ছিলুম এবং পরস্পরে খুব ভাব ছিল। তবে পড়া ও খেলার ব্যাপারে কোন রেষারেষি ছিল না, এমন কথা বলতে পারি না। তখন আমরা নতুন স্কুলে যেতে সুরু করেছি, সেই

জন্য স্কুল সম্বন্ধে বাড়িতে প্রায়ই লম্বা লম্বা কথা বলতুম। অবশ্য গুরুজনদের কাছে নয়,—আমাদের খেলার সাথীদের কাছে। ভাবটা এমন প্রকাশ করতুম যে, স্কুলে আমরা শুধু পড়াশুনোতে নয়, খেলাধূলাতেও যেন ওস্তাদ। আমাদের বাপ-খুড়োরা সব একত্রে ছিলেন,—তখনকার দিনে বড় একান্নবর্তী পরিবার। সেই জন্য আমরা খুড়তুতো, জাঠতুতো ও দূর সম্পর্কের আত্মীয় ইত্যাদি বহু ভাই-বোন, ভাইপো, ভাইঝি একসঙ্গে বাস করতুম, খেলা ও লেখাপড়া করতুম। তবে হয়ত সকলেই আমরা এক স্কুলে কিম্বা এক মাষ্টারের কাছে পড়তুম না। আমাদের বাগানে আর বাড়ির বড় ছাতে, আমাদের খেলার আড্ডা ছিল।

একদিন বিকেলে স্কুল থেকে বাড়ি এসে দেখি—হৈ-চৈ ব্যাপার। সেদিন সকালে স্কুলে আমাদের পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে, আমি এবং আমার জ্ঞাতি ভাই দু'জনেই প্রমোশন পেয়েছি। সে সেদিন কিছু আগে স্কুল থেকে বাড়ী এসেছে এবং তাকে নিয়ে দেখি খুব সমারোহ চলছে। তার বাবা একটা টাকা দিয়েছেন এবং সে হাসিমুখে কি সব বলছে। আমি এসে বল্লুম, "ব্যাপার কি?" আমার খুড়ো বল্লেন, "দেখ দেখি, এ কেমন ভাল ছেলে, আর তুমি কি? জান কি, এ আজ ক্লাসে ,থার্ড হ'য়ে উঠেছে?" আমি বল্লুম, "তাতে কি হয়েছে, আমিও ত ফিফ্‌থ্‌ হয়েছি।" আমার খুড়ো আর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা বল্লেন, "থার্ড আর ফিফ্‌থ্‌ কি সমান?" আমি যত তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করি যে, এতে আমার কোন দোষ নেই, তা তাঁরা কিছুতেই বুঝবেন না আমি বল্লুম, "আমি কি করবো, আমার ক্লাশে যে পাঁচজন

ছেলে।” আমার কথা শুনে সকলে হেসে উঠলেন। আমার খুড়ো বল্লেন, “তোমাদের ক্লাশে পাঁচজন ছেলে বলে কি ফিফ্থ্ হ'তে হবে?” আমি তখন ছেলেমানুষ, আমার কথাটা ঠিক-ভাবে বোঝাতে পাচ্ছি না। এমন সময় মুশকিল-আসান হ'ল— আমার স্কুলের মাষ্টার মশায় এসে উপস্থিত। তিনি এসে আমার জ্ঞাতি ভায়ের পিঠে এক চড় মেরে বল্লেন, “তুই এত খারাপ রেজাল্ট করলি কি করে?” তারপর আমাকে দেখিয়ে বল্লেন, “ও যদিও লাস্ট হয়েছে, তবু তোর চেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছে।” আমাদের বাড়ির সকলে মাষ্টার মশায়ের কথা শুনে অবাক। আমার খুড়ো বল্লেন, “ও ফিফ্থ্ হয়েছে, আর এ যে থার্ড!” মাষ্টার মশায় বল্লেন, “আপনার ছেলে ফোর্থ হবে কি করে? ওর ক্লাশে কি তিনজনের বেশী ছেলে আছে?”

আমি ভাবলুম, যাক্ আমারও একটা টাকা লাভ হ'ল। কিন্তু আমার কপাল খারাপ,—হ'ল ঠিক উল্টো রকম। আমার খুড়ো আমার ভায়ের গালে ঠাস্ ক'রে চড় মেরে টাকাটা কেড়ে নিলেন।

পরে আমার খুড়তুতো ভাই বিজনকান্তি ও আমি হিন্দু স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে (Matriculation Class) পড়ি। আমরা তখন নতুন হিন্দু স্কুলে ভর্তি হয়েছি এবং তখনও সকলের সঙ্গে বেশী পরিচিত হইনি। আমাদের হু'ভায়ের নাম একই রকম ব'লে মাষ্টার মশায়রা অনেক সময় বিভ্রান্ত হতেন। আমাদের হেড মাষ্টার রসময়বাবু আমাদের কখনও “পত্রিকা” বা কখনও “বাগবাজার” ব'লে ডাকতেন। আমাদের কার কোন্ নাম, মাষ্টার মশায়রা সব সময় মনে রাখতে পারতেন না বলে, অনেক সময় আমাদের উল্টো পাল্টাভাবে ডাকতেন।

আমাদের হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষা হয়ে গেছে। আমি ইংরাজীটা ভালই জানতুম। তবে ঠিক কি জন্যে মনে নেই, আমি ইংরাজীর একটা পেপারে অত্যন্ত খারাপ পরীক্ষা দিয়েছি। আমি জানি যে, এ পেপারে ফেল ত হবই কিন্তু একশ'র মধ্যে মাত্র কত নম্বর পাব তা ঠিক আন্দাজ করতে পারছি না। তবে ২০।২৫-এর বেশী যে নয় তা নিশ্চয়।

একদিন আমাদের ইংরাজীর মাষ্টার, যিনি ঐ পেপারটির পরীক্ষক, ক্লাশে এসে আমাদের হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলেন। তিনি বল্লেন যে, তাঁর পেপার দেখা শেষ হয়ে গেছে এবং আমাদের খাতাগুলো তাঁর বাড়িতে আছে। তার পরদিনই আমরা আমাদের খাতা ফেরত পাব। তিনি তারপরে দু'চারজন ছেলের নাম করে, কে কেমন লিখেছে তার আলোচনা করতে লাগলেন। আমার বুক ঢিপ্ ঢিপ করছে, এই বুঝি আমার নাম ধরে গালাগালি বা মার-ধোর
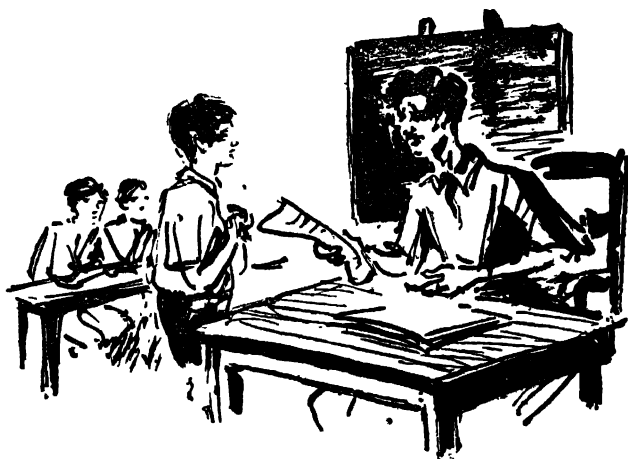
আরম্ভ হয়ে যায়। যা ভাবছিলুম তাই হল, তবে একটু উল্টো রকমভাবে। মাষ্টার মশায় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, বিজনকান্তি কার নাম? বিজনকান্তি দাঁড়িয়ে উঠলো। মাষ্টার মশায় বল্লেন, "এদিকে আয়।" বিজন তাঁর ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল। মাষ্টার মশায় আরম্ভ করলেন, "বেঁচে থাক বিজনকান্তি। কি নেকাই নিকেছ বিজনকান্তি। এমন নেকা কোথায় শিখলে, বিজনকান্তি?" বলেই দমাদ্দম চড় ও গাঁট্টা। আমি ভাবছি এ কি? বিজন কি আমার চেয়েও খারাপ লিখেছে, নইলে মার খেয়ে মরবে কেন? কিন্তু বিজন তো বরাবরই আমার চেয়ে লেখা-পড়ায় ভাল। ভাবছি, এইবার হয়ত আমার পালা। কিন্তু আমার বরাত ভাল। বিজন এক চোরের মার খেয়ে তার সিটে ফিরে এল, আর মাষ্টার মশায় আর একটা ছেলের লেখা নিয়ে মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগলেন। পরদিন আমরা যখন আমাদের খাতা ফেরত পেলুম তখন দেখলুম যে, বিজন একশ'র মধ্যে একান্ন পেয়েছে। আর আমি কত পেয়েছিলুম সে কথা আর বল্লুম না। বলবার মত নম্বর সে নয়।

আমার এক দূর সম্পর্কের ছোট্ট ভাইপো তার বাবাকে একবার থ বানিয়ে দিয়েছিল। তার বয়স তখন আট। দিন-রাত খেলে বেড়াবে, একবারও পড়তে বসবে না। তার মা বলে বলে হার মেনে গেছেন। অথচ পরীক্ষা এসে গেছে। একদিন তিনি দাদাকে বল্লেন, "ছেলে একটুও পড়ে না, পাস করবে কেমন করে? তুমি কিচ্ছু বলবে না?" দাদা বল্লেন, "কেন, আমি ত দেখি ও দিনরাত মুখ শুকনো করে থাকে। বোধ হয় পরীক্ষার ভয়ে। যে পরীক্ষার জন্য ভাবে, সে কি

আর পড়ে না ? তুমি কিচ্ছু ভেব না,—ও ঠিক পাস করবে।” বৌদি কিন্তু নাছোড়বান্দা। তিনি তাঁর ছেলেকে বেশ জানেন। দাদা কাজে ব্যস্ত, কাজেই কোন খবর রাখেন না। বৌদি বল্লেন, “তুমি ছেলেকে ডেকে বেশ করে বকে দাও, নইলে শেষে অনুতাপ করতে হবে।” দাদা আমার ভাল মানুষ। কি আর করেন, ছেলেকে ডেকে পাঠালেন। ভাইপোটি আমার বিচ্ছু, আস্তে আস্তে সামনে এসে দাঁড়াল। মুখ অত্যন্ত গম্ভীর ও ম্লান, যেন পরীক্ষার ভাবনায় আহার নিদ্রা গেছে। দাদা বল্লেন, “হ্যাঁ রে, তুই পড়াশুনো ক'রছিস, না খালি খেলে বেড়াচ্ছিস ?” ছেলে বল্লে, “বাবা, তুমি বড় অসময়ে টিক টিক কর ? একে ভাবনায় মরে যাচ্ছি।” বাপ বল্লেন, “কিসের ভাবনা ? পড়ায় মন দে।” ছেলে বল্লে, “বাবা তুমি কিচ্ছু বোঝ না। সামনে এগ্‌জামিন, পড়ি কখন ?”

এবারে শুধু আমার দাদা নন, বৌদিও থ বনে গেলেন। সত্যি তো, ছেলে ত ঠিক কথাই বলেছে। বেচারীর সামনে এগ্‌জামিন, পড়ে কখন বল ত ?

বাবাজীর পরীক্ষার ফল কি হয়েছিল সে কথা এখানে বলা অনাবশ্যক। কিন্তু মজার কথা এই যে, আমার সেই ভাইপোটি এখন যে শুধু শিক্ষিত তাই নয়, দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত।

সে আজ প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগেকার কথা। আমার জীবনে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেটার সত্যকার তাৎপর্য কি, তাহা আমি আজিও বুঝিতে পারি নাই। আমি যাহা লিখিতেছি তাহা যে শুধু সত্য তাহাই নহে, আমি যাহা বর্ণনা করিতেছি, তাহাও অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আমাকে

জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এতদিন বাদে এত খুঁটিনাটি কথা আমার মনে রহিল কি করিয়া। তাহার কৈফিয়ৎ ইহাই যে আমি এই ঘটনাটি বহুবার আমার অন্তরঙ্গদের নিকট বর্ণনা করিয়াছি। এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল দিল্লীতে, কুইন রোডস্থ করোনেশন হোটেলে। ইহা সম্যক্ বুঝিতে হইলে ইহার কিছু-দিন আগেকার কথা জানা আবশ্যক,—তাহা বলিতেছি।

সেদিন সরস্বতীপূজার ভাসান। তখন আমাদের পত্রিকার নূতন বাড়ি নির্মিত হয় নাই। আমরা তখন ২নং আনন্দ চ্যাটার্জির লেনে থাকি। আমাদের বাড়ির বাগানে সেইদিন বিকালে আমরা কয়জনে, ব্যাড্‌মিনটন খেলিতেছিলাম। আমার ছোড়দাদা (আমার ঠিক উপরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) সেইখানে বেড়াইতেছিলেন ও মধ্যে মধ্যে দাঁড়াইয়া আমাদের খেলা দেখিতেছিলেন। আমি দেখিতেছিলাম যে, ছোড়দাদার মুখ বড়ই বিষণ্ণ, যেন কি চিন্তা করিতেছেন। দু' একবার আমাকে যেন কি বলিতে চাহিলেন, কিন্তু বলিলেন না। খেলা শেষ হইলে ছোড়দাদা আমাকে এক পাশে ডাকিয়া অতি বিষণ্ণ স্বরে বল্লেন, "দেখ্, যদি আমি হঠাৎ মরে যাই, তুই তোর ছোটবৌদিকে ও ছেলে-মেয়েদের দেখাশুনা কর্‌বি তো?" আমি এই কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম ও ছোড়দাদার মন হইতে ঐরূপ ভাব দূর করিবার জন্য বলিলাম, "কি পাগলের মত যা-তা বক্‌ছো—তুমি হঠাৎ মরতে গেলে কেন, আর আমারই বা তোমার ফ্যামিলিকে দেখবার কি দরকার হল?"

আমার কাছে বকুনি খাইয়া ছোড়দাদা তখন চুপ করিয়া গেলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার আমাকে বলিলেন, "তুই রাগ করছিস্ কেন? মরা-বাঁচার কথা কে বল্‌তে পারে? আমার যদি হঠাৎ কিছু হয়, তুই ওদের দেখ্‌বি তো?" আমি রাগ করিয়া বলিলাম, "না, দেখব না। তোমার মত পাগলের সঙ্গে আমি বকতে পারি না।"—এই বলিয়া আমি সেখান হইতে চলিয়া গেলাম। নিজের মনকে বুঝাইলাম যে, ছোড়দাদাকে ঐরূপ বলিয়া আমি ভালই করিয়াছি। ইহাতে তাঁহার মনের দুর্বলতা ও বিষণ্ণতা কাটিয়া যাইবে। হায়, তখন বুঝিতে পারি নাই যে, নিজের জন্য কি শেল প্রস্তুত করিতেছি।

সরস্বতীর বিসর্জন দিয়া রাত্রে আহারের পর অতি ক্লান্ত হইয়া সবে মাত্র ঘুমাইয়াছি, এমন সময় আমার দুয়ারে ধাক্কা পড়িল। দরজা খুলিয়া শুনিলাম যে, ছোড়দাদার হঠাৎ অত্যন্ত হাঁপানি হইয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ নিচে তাঁহার ঘরে গিয়া দেখিলাম যে, তিনি যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "ডাক্তার! আর সহ্য করতে পাচ্ছি না!" তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আনা হইল এবং তিনি আসিয়াই মর্ফিয়া ইন্‌জেক্‌সন দিলেন। হায়, তখনও যদি ছোড়দাদাকে আমার মনের কথা বলিতাম! কিন্তু তখনও তো বুঝি নাই আমাদের কি সর্বনাশ হইতেছে? ইন্‌জেক্‌সনের পর ছোড়দাদা বল্লেন, "আঃ, কি আরাম!" এবং তৎক্ষণাৎ ঘুমাইয়া পড়িলেন। তার পরদিন সকালে কিছু বেলাতে শুনিলাম যে, ছোড়দাদা তখনও ঘুমাইতেছেন। আমরা ভাবিলাম ইহা মর্ফিয়ার ফল—তখনও আমাদের মনে কোন আশঙ্কা জাগে নাই। তাহার পর যখন অনেক বেলাতেও ছোড়দাদার ঘুম ভাঙ্গিল না তখন আমরা ডাক্তার আনিলাম, কিন্তু তখন আর কিছু করিবার ছিল না—আমার স্নেহময় ছোড়দাদা তখন মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি আর জাগিলেন না, আর কথা কহিলেন না।

বলিতে হইবে কি, আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। ভ্রাতৃবিয়োগের অপেক্ষা আরও বড় আঘাত আমার হৃদয়কে মথিত করিতে লাগিল—কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিজের হৃদয়কে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, কেন ছোড়দাকে সত্য কথা বলিলাম না? কেন তাঁহাকে বলিলাম না যে, আমি তোমার সংসার দেখিব—দেখিব—দেখিব। কিন্তু তখন কে আমার কথা শুনিবে?

ইহার পর হইতে আমার হৃদয় সর্বদাই অনুতাপে দগ্ধ হইত।

বার বার ছোড়দাদাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতাম—"সেদিন ব্যাডমিনটনের মাঠে আমি তোমাকে মিথ্যা কথা বলিয়াছি।" কিন্তু কিছু মাত্র শান্তি পাইতাম না, মন সর্বদাই অবর্ণনীয় ব্যথায় ভরিয়া থাকিত।

ইহার অতি অল্পদিন পরেই আমাকে কোন বিশেষ কাজে দিল্লী যাইতে হয়। দিল্লীতে বিকালে পৌঁছিয়া করোনেশন হোটেলে উঠিলাম। সন্ধ্যার পর স্নান করিয়া আমার রাত্রের খাবার আনিতে আদেশ করিলাম। হোটেলের চাকর আসিয়া বলিল যে, তখনও খাবার প্রস্তুত হইতে সামান্য কিছু বিলম্ব আছে। সময় কাটাইবার জন্য আমি একখানি বই লইয়া শয্যায় শয়ন করিলাম।

একটুখানি পরে মনে হইল, যেন আমার শরীরটি অত্যন্ত হাল্কা বোধ হইতেছে। ক্রমে বোধ হইল, যেন আমি আমার বিছানার উপর শূন্যে ভাসিতেছি। একটু একটু করিয়া আমার দেহ শূন্যে ভাসিতে ভাসিতে চলিতে আরম্ভ করিল। আমার মাথার নিকট যে জানালা খোলা ছিল তাহার ভিতর দিয়া বাহির হইলাম এবং ক্রমে উর্ধ্বে উঠিতে লাগিলাম—আমার যে এই অবস্থা হইয়াছে এবং আমি যে কিছু অস্বাভাবিক বোধ করিতেছি তাহা আমার মনে হইল না। শূন্যে ভাসিয়া চলা যেন আমার কাছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমি অতি আরামে ও সহজভাবে যাইতে লাগিলাম।

খানিকটা উর্ধ্বে উঠিয়া একদিকে যাইতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে আমার চারপাশের আলোকোজ্জ্বল অবস্থা অস্পষ্ট হইতে লাগিল। একটু পরে গভীর অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। কোথা দিয়া যাইতেছি এবং কোথায় আমার গন্তব্য স্থান কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

ক্রমে ক্রমে আমার আশপাশে আবার অস্পষ্ট আলোক ফুটিতে লাগিল; যেন তৃতীয়া কিম্বা চতুর্থীর চাঁদের আলো। ক্রমে আরো একটু স্পষ্ট হইলে আকাশে বহু তারা ও পারিপার্শ্বিক দৃশ্য দৃষ্টি-গোচর হইতে লাগিল। ক্রমে চাঁদের আলো বাড়িতে লাগিল, যেন চাঁদ পূর্ণিমার দিকে অগ্রসর হইতেছে, আমি দেখিলাম এক সুরম্য বনপথে অগ্রসর হইতেছি। নির্জন প্রান্তর, নদী, পর্বত ও বন অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলাম। ক্রমে চাঁদের আলো আরো বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক দৃশ্য আরো সৌন্দর্যময় হইতে লাগিল। চারিদিকে ফুল ফুটিয়া আছে, ফুলের সুগন্ধে আকাশ বাতাস ভরিয়া আছে। সে সৌন্দর্যের বর্ণনা হয় না! আমার মন-প্রাণ আনন্দে ভরিয়া গেল। কিন্তু কোন জনমানব দেখিলাম না।

একটু পরেই এক নির্জন প্রান্তরে একটিমাত্র সাদা বাড়ি দেখিলাম! সেখানে আর কোন বাড়ি ঘর নাই বা সেখানে কোন গ্রাম আছে বলিয়া বোধ হইল না। বাড়িটি উঁচু ও ছাদের উপর একটি চিলে কোঠা দেখিলাম। আমি শূন্যে ভাসিতে ভাসিতে ছাদের পাঁচিল ডিঙ্গাইয়া ছাদে অবতরণ করিলাম। সমস্ত ছাদ পূর্ণিমার আলোকে উদ্ভাসিত কেবল একাংশে সেই চিলে কোঠার ছায়া পড়িয়াছে; দেখিলাম, সেই ছায়াতে ছাদের পাঁচিলে হাত রাখিয়া আমার ছোড়দাদা দাঁড়াইয়া আছেন।

ছোড়দাদাকে দেখিয়া বিদ্যুতের মত আমার হৃদয়ে একটিমাত্র কথার উদয় হইল যে, এই তো ছোড়দাদাকে পাইয়াছি—এখুনি কেন তাঁহাকে আমার মনের কথা বলি না? আমি ছুটিয়া তাঁহার নিকটস্থ হইয়া বল্লাম, "ছোড়দাদা, ছোড়দাদা, আমি আগে

তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছি। আমি তোমার ছেলে-মেয়েদের দেখাশুনা কর্‌ব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

ছোড়দাদা আমার দিকে ফিরিলেন ও হাসিলেন। সে হাসি যে কত করুণ তাহা আমার বুঝাইবার সাধ্য নাই। তিনি বলিলেন, "ওরে, তা কি আমি জানি না ভাই?" পরমুহূর্তেই ছোড়দাদা কেমন যেন উত্তেজিত হইয়া বল্লেন, "যা, এখুনি ফিরে যা, আর এখানে একমুহূর্তও থাকিস্‌ না।" ছোড়দাদা একথা বলিবামাত্র আমার দেহ প্রত্যাবর্তন করিতে আরম্ভ করিল; আমি আর দ্বিতীয় কথা বলিবার সুযোগ পাইলাম না। আমার দেহ ছাদের পাঁচিল ডিঙ্গাইয়া শূন্যে ভাসিতে ভাসিতে চলিতে লাগিল। ফিরিবার পথ বর্ণনা করিবার আবশ্যক নাই, কারণ যে পথ দিয়া গিয়াছিলাম সেই পথ দিয়াই প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলাম। সেই ফুলবন, ফুলের গন্ধ, নির্জন প্রান্তর, নদ, নদী, পর্বত—এবং গভীর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চাঁদের আলো যাইবার সময় যেরূপ কমবেশী হইয়াছিল, ফিরিবার সময় উল্টাভাবে, সেইরূপই দেখিলাম। সেই গভীর অন্ধকারের ভিতর দিয়া আসিতে হইল এবং অবশেষে হোটেলের জানালা-পথে আমি গৃহে প্রবেশ করিলাম।

সবেমাত্র বিছানায় শুইয়াছি, এমন সময় আমি শুনিলাম, "এ সাব, আপকা খানা লায়া"—হোটেলের চাকর বলিতেছে।

উপরে যাহা লিখিলাম, তাহা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। আমার গমন ও প্রত্যাগমনে কত সময় লাগিয়াছিল বলিতে পারি না! বোধ হয় মিনিট কয়েক হইতে পারে। ইহা কিরূপে হইল, কেন হইল, তাহা আমি আজও বুঝিতে পারি নাই।